রমাপদ চৌধুরীর ছোট গল্প

প্রসূন ঘোষ

১.

রমাপদ চৌধুরীর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। পটভূমি হিসাবে স্থাপন করেন শহর মফস্বল প্রত্যন্ত গ্রাম সবকিছুকেই। তাঁর গল্পে নগরী কলকাতার অনুপুঙ্খতা যেমন, তেমনই অজ পাড়াগাঁর detail-ও উপস্থাপিত হয়েছে।

গল্পকার বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সময় সম্বন্ধেঅত্যন্ত সচেতন। তাই মানবমনের নানা কোমল অনুভূতি, যেগুলি চিরন্তন ও শাশ্বত সেগুলির ক্ষণভঙ্গুরতা সম্বন্ধেপ্রশ্ন তুলেছেন তিনি। অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তুলে ধরেন সমকালীন বিভিন্ন অস্থিরতাকে। তাই, উনিশ শতক বা বিশ শতকের প্রথম দিকে অল্প বয়সী তণ-তণীর প্রেম ও তার পরিণতি সম্বন্ধে যে ধারনা আমাদের বদ্ধমুল— সেই প্রচলিত ধারনাকে আঘাত করেন তিনি। একালের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রেম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেনঃ " বস্তুত প্রেম জিনিসটা এযুগে একটা কথার কথা মাত্র। কারণ মানুয়ের জন্য মানুষের ভালবাসা বা দরদ প্রায় শূন্যে ঠেকেছে। একালে ঘনিষ্ঠআত্মীয়দের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন শিথিল এবং নিস্পৃহ। আজকাল বাবা মা মারা গেলেও ছেলেরা তেমন কাঁদে না।" রমাপদ 'দিনকাল' গল্পে অন্তর বাবার প্রথম জীবনের একমাত্র প্রেমের সঙ্গে অন্তর প্রেম এক নয়, প্রেম সম্বন্ধে ধ্যানধারনারও মিল নেইকোনো। এ প্রেম ত্রিশ চল্লিশের প্রেম নয়; এ প্রেম নির্বিকার আসক্তির হালকা বন্ধন মাত্র। ইউনিভার্সিটিতে পড়া ছেলে অন্তর গার্লফ্রেন্ডটুকটুক ফোন করে কেবলই। খোঁজ নেয়, বাড়িতে যাতায়াত করে— প্রথম প্রেমের মতোই সলজ্জতা তাতে। অন্তর বাবা-মা জানেন ছেলে বিয়ে করবে টুকটুককে — টুকটকের মতো মিষ্টি মেয়েকে। স্বভাবতই তারা মেনে নিতে প্রস্তুত, প্রগতিশীল পিতা প্রথম জীবনে ব্যর্থপ্রেমের যে ব্যথা পেয়েছিলেন, তা আর দিতে চান না ছেলেকে। তাই ঈশ্বরের কাছে তাঁর একমাত্র নিবেদন —ছেলে যেন সুখী হয়। এইভাবে, মান-অভিমান-প্রেম প্রণয় যখন চলছে, অন্তত অন্তর বাবার মনে হচ্ছে, ঠিক সেই সময় জানতে পারলেন টুকটকের বিয়ে— টুকটুক নিজে এসেছে খবর দিতে। অন্য আর পাঁচ দিনের সঙ্গে সেইদিনও টুকটুকের আচরনে কোনো পার্থক্য বুঝতে পারলেন না অন্তর প্রবীণ পিতা। প্রতিদিনের মতো আশর্চ্য স্বাভাবিক সমস্ত কিছুই— অন্ত বাড়ি নেই, কাজেই কিছু পরে আসবে টুকটুক ।

টুকটুকের ফিরে যাওয়া এবং আবার আসা— এই মধ্যবর্তী সময়টিতে ভেবে অস্থির অন্তর বাবা-মা, যেন জন্মান্তর ঘটে গেল তাদের। কতখানি ব্যথা পাবে অন্ত— জীবনের প্রারম্ভে একদিন ব্যথা পেয়েছিলেন তিনি, সে ব্যথার তীব্রতা ও ভয়াবহতা দুই-ই জানেন। আর তাই ব্যথিতবেদন পিতা অন্তর আঘাত পাওয়া অন্তরের সঙ্গী হতে চান, টুকটুক এলে কান পেতে থাকেন তিনি। কিন্তু যাবতীয় সাস্পেনস্ - এর অবসান ঘটিয়ে অন্ত টুকটুকের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করতে -করতে বেরিয়ে আসে, নিমন্ত্রণ করতে যাবে বন্ধুদের, যেন এ ত প্রত্যাশিতই ছিল, কোনো অস্বাভাবিকতা নেই তাতে । বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই প্রেমের স্বরূপ জানা নিশ্চয়ই সম্ভব হয়নি অন্তর ভুক্তভোগী পিতার। গল্পটি পড়ে মনে হয়, এর স্বরূপ বোঝা সম্ভব কি আমাদেরও ? নাকি অন্তও দুঃখ পাবে! সেও ত ওই আধুনিক বিচ্ছিন্ন অন্তরের শরিক । তাই সে তার বুভুক্ষু অন্তরকে প্রকাশ করতে পারে না, কোনো অনুভুতিই হয়তো তার হয় না । আমরা প্রতিনিয়ত বেদনাকে বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াই অথচ সংসারে পাঁচজনের কাছে এমনকি একান্ত আপনজনের কাছে, কখনো কখনো নিজের কাছেও বা কমেডির চরিত্রের মতো অভিনয় ক'রে যাই— সংসারে সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি বোধ হয় এটাই। এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে অ্যালবের

কামুর 'Outsider' এর নায়কের কথা ।তার প্রেমিকা তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করেছিল যে সে তাকে ভালবাসে কি না? তার উত্তরে সে বলেছিল ঃ " I replied much as before, that her question meant nothing or next to nothing, but I supposed I did n't"2 কী সীমাহীন নৃশংস নির্লিপ্ততা।"

এই ভাবেই শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রেমে পুষ্পিত পেলবতা, উজ্জ্বলতা বা প্রত্যাশা নয়; দেখা দিয়েছে ঊষরতা, হতাশা ও স্বার্থবোধ। মানুষের প্রবঞ্চনা ও স্বার্থবোধের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত 'নতুন চশমা' গল্পটি। গল্পে প্রেম কোমল অনুভব হয়ে দেখা দেয় নি, বরং প্রেম হয়ে উঠেছে ছেলেখেলার ব্যাপার, যা প্রকারান্তরে প্রহসন । যদিও একজনের চালাকি, দ্বিতীয়জনের বুঝতে সময় লেগেছে। সময় চলে গিয়েছে, চোখে পরা চশমা পুরোনো হয়ে গিয়েছে, হয়তো— বা হারিয়েও গিয়েছে, আর তখনই সে বুঝতে পেরেছে, এতদিন যা দেখেছি তা ভুল দেখেছি; চশমাটা ফিরে পেয়েও নেওয়ার আর ইচ্ছা থাকে না তখন। মনে হয়— নতুন কোনো চশমা কিনে নিয়ে গিয়ে অভিনবভাবে দেখব পৃথিবীটাকে। একসময়ের প্রেমিকা বিবাহিত লহনার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল প্রেমিক কথকের—এক বিবাহ-অনুষ্ঠানে। এক লহমায় লহনা আলোড়ন তুলেছিল প্রেমিকের হৃদয়ের "..... এখনই বললে না, সেদিন তোমার কোনো হাত ছিল না। আজ আছে ? আছে সেই সাহস? চলো, এখনই এই মূহূর্তে যেখানে খুশি তুমি আমাকে নিয়ে চলো। অপবাদকে আমি ভয় পাই না, দারিদ্রকে ভয় পাই না। যাবে নিয়ে যাবে আমাকে?" কিন্তু এই লহনার সঙ্গে তার স্বামীর বাড়িতে কথক দেখা করলে আজকের ভদ্রতা মাখানো সৌজন্য টুকুই দেখিয়েছে, সহানুভুতি দেখায়নি বিন্দুমাত্র। এমনকি ভুলে ফেলে আসা চশমাটা নিতে গেলে কথক জনান্তিকে শোনে লহনার বিদ্রূপ তার অতি প্রিয় স্বামীর কাছে, তাকেই উদ্দেশ্য ক'রে —"সশব্দে হেসে উঠে লহনা বললো, কি নির্লজ্জ দেখো, বাড়ি বয়ে দেখা করতে এসেছে! ও কি ভাবে জানো? ..... লহনা আবার হেসে উঠে বললে, ও ভাবে আমি ওকে ভালবাসি—ভালবাসতাম। পুষ জাতটা যে কি বোকা হয়!" এ চরিত্র আমাদের অতি পরিচিত চরিত্র, কিন্তু রমাপদর উপস্থাপনার গুনে তা বৈচিত্রময়ী ও আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। মেট্রোপলিটন মন সম্বন্ধে তিনি খুব সুন্দর বলেছেনঃ " ধনতান্ত্রিক মহানগরের মানুষের কাছে হৃদয় পরিত্যক্ত। জীবনে এই বস্তুটি তার কোন কাজে লাগে না।..... ..... এক খন্ড ইট, অথবা এক টুকরো পাথর অথবা লোহার রড অথবা এক বস্তা সিমেন্ট , এসবের দাম আছে কিন্তু হৃদয়ের কোনো দাম নেই। শহরের কোনো একস্পার্ট নিলামওয়ালাও পাব্লিক অক্শনে তাকে এক পয়সা দামেও বেচতে পারবে না।..... সস্তা জিনিসেরও সত্তা আছে কিন্তু নাগরিক জীবনে হৃদয়ের কোনো সত্তাই নেই ।"৩

আধুনিক যুগের ব্যস্ততা ও আধুনিক মানুষের উচচাশা তথা বড় হবার প্রবণতা প্রেমকে ক্রমশই কোণঠাসা ও মালিন্যময় করেতুলেছে। যন্ত্রের অতিপ্রাধান্য মানবমনকে বড় বেশী যান্ত্রিক করে দিচ্ছে। বর্তমানে অবসর নেই, দিন যাপনের পর প্রাত্যহিক বিশ্রাম নেই, ক্লান্তিকর একঘেয়েমিতে দিন কাটাবার পর সামান্যতম বৈচিত্র্যও আনতে চাই না আমরা, অথবা চাইলেও আনতে পারি না। তাই, দাম্পত্যজীবনেও ব্যস্ততা আসে, প্রেমে ভাঁটা পড়ে যায় প্রাত্যহিক সংসারের বহুমাত্রিক চাপে। তারপর, একদিন কোন -এক দ্ধাস মুহূর্তে স্বামী-স্ত্রীর মনেও প্রশ্ন জাগে— কোথায় সেই কৈশোরের বা প্রাকযৌবনের মিষ্টি মধুর সলজ্জ প্রেম? কোথায় হারিয়ে গেল সেই বর্ণময় রঙীন বহু স্বপ্নে ভরা অযুত আশা-আকাঙ্খায় পূর্ণ দিনগুলি? কেন এমন হল? কেন এমন হয়? আমরা ক্রমাগত কোন্ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ধাবিত হচ্ছি, কোথায় যেতে চাই আমরা? সামান্যতম স্বাচ্ছন্দ্যই যথেষ্ট তবে আমরা কেন আরো পেতে চাই? আর এই পেতে চেয়েই হারিয়ে ফেললাম আমাদের অনুভুতিগুলো। অনুভুতিশীল লোকের বিষয়ী হয়ে ওঠা তথা অনুভূতি হারানোর যন্ত্রনা এক বিষম যন্ত্রনা, আধুনিক মানুষের এক ধরনের সংকট বলা চলে।

শান্তনু একসময় উপহাসাস্পদ ছিল কথক এবং তার প্রেমিকা নীলিমার কাছে, কেননা অল্প বয়সেই সে বিয়ে ক'রে ফেলেছে (ঈর্ষা) । কিন্তু বাস্তববাদী ভাবী-দম্পতি বড্ড হিসাব নিকাশ ক'রে চাকরী পাওয়ার পর বিয়ে করেও সংসারের চাকাকে সচল রাখতে উপরি আয়ের প্রয়োজনে সদা ব্যস্ত। কেউ নিমন্ত্রণ করলে তা রক্ষা করা, দুরূহ হয়ে পড়ে, কেননা "প্রবন্ধটা যে আজকেই চাই" । সিনেমার টিকিট কেটে স্ত্রীকে অনুরোধ করলে সে বলে ওঠে "না জিজ্ঞেস করেই টিকিট কাটলে?" কিন্তু পাশাপাশি গেঁয়ো বউকে নিয়ে শত অনটন সত্ত্বেও অদ্ভুত আন্তরিকতা নিয়ে সংসার করে যাচ্ছে শান্তনুরা।

অথচ দিনের পর দিন দুঃসহ যন্ত্রনা ভোগ করে যাচ্ছে নীলিমা আর তার স্বামী— কেননা তাদের অভাব নেই, স্বামী -স্ত্রী দুজনেই রোজগার করে ; অথচ সর্বদা অর্থনৈতিক সাধনায় মগ্ন তারা, কিংবা "আহা, শুধু টাকার জন্যেই নাকি! ..... প্রেস্টিজ বলে তো একটা কথা আছে।"

বঙ্কিম চন্দ্র থাকলে হয়ত বলতেন প্রেস্টিজ বহির কথা । যাই হোক রমাপদ আরো কিছু ছোটগল্প লিখেছেন যেগুলির বিষয়বস্তু প্রেম। কি ন্তু গল্পগুলির গঠন চরিত্রগুলিতেও মহানগরের সুতীব্র জটিলতা নেই, মেট্রোপলিটন মন ক্রিয়াশীল নয় তাতে । তবে , এই গল্পগুলোতেও বর্ণনার ভঙ্গিটি অতীব অনায়াস, সংলাপেও লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় রয়েছে। এইসব গল্পে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রেম কথকের নয়, কথকের পরিচিত বন্ধু বা সমশ্রেণীর ঐ জাতীয় কারো 'স্বর্ণলতার প্রেম' গল্পে অলক ও স্বর্ণর প্রেম হল— কথক তা জানল, অলকের চিঠি লেখার কাজটি নিপুণভাবে করল সে । তারপর একদিন সে প্রেম হারিয়ে গেল, স্বর্ণর বিয়ে হল, অলক হতাশ হয়ে তার একমাত্র চিহ্ চিঠিগুলিও ফেলে দিতে চাইল, কিন্তু চিঠিগুলি রেখে দিল কথক, তার একান্ত নিঃসঙ্গতার সঙ্গী হিসাবে। 'জনৈক নায়িকার মৃত্যু' গল্পে লেখককে জনৈক নায়ক তার প্রেমের কথা লিখে পাঠিয়েছিল। কলকাতাবাসী প্রেমিক গ্রামে গেলে এক নারীর সঙ্গে কেমন এক সম্পর্ক গড়ে উঠল এবং সে আব ার কলকাতা ফিরে এলে দীর্ঘসময় সেই সম্পর্কের ছেদ পড়ল, কেবল অন্তরেই রয়ে গেল সেই নারী। নায়িকার বিয়ে হল, তারপর কোন এক বিবাহ-অনুষ্ঠানে ঘোমটার আড়ালে শুধু জিজ্ঞেস করল 'ভালো আছো?' — আর সেই মুহূর্তেই তার স্বপ্নের নায়িকারও মৃত্যু ঘটল। এবং এইভাবেই গল্পগুলি লেখকের বিশিষ্টতার পরিচয় পুরোপুরি বহন করতে পারে না, গল্প হিসাবেও তেমন মূল্যবান বলে মনে হয় না আমাদের কাছে। কিন্তু যা নেই সেই সমস্ত আলোচনা করা আমাদের লক্ষ্য নয়, বরং যা আছে তাই-ই আমাদের উদ্দিষ্ট।

২. বাংলা গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার প্রাধান্য, তার কারণ লেখকেরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত । যদিও কেউ কেউ সাময়িকভ াবে এই জীবন থেকে অন্যজীবনকে উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছেন। রমাপদ এমনই একজন লেখক। যদিও মধ্যবিত্ত ম ানুষের সীমাবদ্ধতাকে সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি । আমরা যা করতে চাই, প্রতিনিয়ত তা করতে পারি না। । আম াদের স্বপ্ন আর আশা ভেঙ্গে যায় সদা। আমরা আমাদের ভিতরের কুৎসিৎ নগ্নতা বাহ্য আবরণের অন্তরালে ক্রমাগত ও প্রতিনিয়ত চাপা দিয়ে রাখতে চাই। কিন্তু কোন -এক প্রতিকূল মুহূর্তে সেই স্বতঃভঙ্গ খোলসটি খসে পড়ে বীভৎস কদর্যতাই প্রকাশিত হয়ে যায়। 'ঋণ' গল্পে বানারসের ইঞ্জিনিয়ার ছাত্র গঙ্গার জলে উদ্ধার করে বৃদ্ধ পিতামাতার একমাত্র সন্তান ব াবুয়াকে । একথা ঠিক, মানুষের প্রাণ বাঁচানোর মতো উপকার এই পৃথিবীতে আর হতে পারে না। আর সেই কারণেই , ত ার পরিবর্তে কথক সারাজীবন ধরেই প্রতিদান প্রত্যাশা করেছে। হয়ত'বা মেলানো যায় না মোটেই, তবুও মনে পড়ে যায়, শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসে মহিমকে জল থেকে বাঁচানোর জন্য সুরেশ মনে পড়িয়ে দিয়েছিল সেকথা। আর সেই প্রশ্নের প্রতিপ্রশ্ন হিসাবে অচলা দৃপ্তস্বরে বলেছিল ঃ "..... যাকে এক সময় বাঁচানো যায়, আর এক সময়ে ইচ্ছা করলে বুঝি তাকে খুন করা যায়?" 'ঋণ' গল্পের কথকও উপকারের পরিবর্তে সমাজসেবার নামে কারনে ও প্রায় অকারনে নিষ্ঠুর ও হ াস্যকরভাবে চেয়ে পাঠিয়েছে টাকা। যথাসম্ভব টাকাও পাঠিয়েছে বাবুয়ার বাবা। কিন্তু টাকা পাঠানো বন্ধ করলে কথক নিজেই অপরিকল্পিতভাবে, কিছুটা আকস্মিকভাবেই হাজির হয়েছে তার কাছে। এরপরই গল্পটির প্রাণ। কথক দেখেছে বৃদ্ধ স্থবির এক পিতাকে, নিঃস্ব-নিঃসহায় এক মানুষকে । বাবুয়াকে বাঁচানোর প্রায় এক মাস পরে অর্থাৎ বানারস থেকে ফিরে আসার মাসখানেক পরেই মারা গিয়েছিল বাবুয়া। অথচ, বাবুয়ার বাবা আজীবন ঋণ শোধ ক'রে গিয়েছে কথকের। গল্পটির শেষটিও অতি চমৎকার ঃ "আর, আর বাবুয়া মারা গেছে, তবু তার জীবন বাঁচানোর কৃতজ্ঞতার ঋণ সারা জীবন ধরে শোধ করে গেছেন নিবাগুরের রাজা বিনয়েন্দ্রমোহন সিংহরাও—যার মৃত্যু সংবাদ বেরিয়েছে আজকের খবরের ক াগজে। তাও মাত্র পাঁচ লাইনে। আজ তাই তাঁকে নিয়েই এ গল্প লিখলাম। কিন্তু এত সহজে কি তাঁর ঋণ শোধ করা য াবে?

এমনই এক মধ্যবিত্ত মানসিকতার চমৎকার উদাহরণ 'ঠগ' গল্পটি। গল্পের ঘরোয়া ভঙ্গিটি আকৃষ্ট করে পাঠককে । গল্পের শেষে এই প্রশ্ন আমাদের মনে উঁকি দেয় যে ঠগ্ কে? কথকের দাদামশাই না তার মেজোমামীমার বাবা? আসলে, আমরা

প্রত্যেকেই বোধহয় প্রায় একই ধ্যানধারণা তথা সংস্কারে আচ্ছন্ন। প্রতিনিয়ত অপরের দোষ দিই, অথচ নিজের ত্রুটিকে আড়াল করতে আমাদের জুড়ি মেলা ভার । বরপক্ষের কাছে পায়ের ত্রুটীর উল্লেখ না করে মেজোমামীমার বিয়ে দিয়েছিলেন তার পিতা। সেটা হয়ত বা একধরনের ফাঁকি। কিন্তু নিজের ছেলের একবার বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও যখন আর একবার বিয়ে দেওয়া হয় এবং পাত্রীটিকে বা তার অভিভাবককেও জানানো হয় না সেকথা, তার জীবনকে প্রায় ধ্বংসের দিকেই ঠেলে দেওয়া হয়; তখন পূর্বের প্রবঞ্চনার কাছে সে প্রবঞ্চনা আরো ভয়াবহ, আরো দোষাবহ নয় কি?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় সাধারণ মেয়ের যন্ত্রনাকে পরিস্ফুট করেছেন। প্রেম ছিল , ভালবেসেছিল সে একটি ছেলেকে, যে বিলেত গিয়েছিল পড়তে। কিন্তু সেই বহুবল্লভ প্রেমিক কোন মূল্য দেয়নি তার প্রেমিকার প্রেমের। স্বপ্ন দেখেছিল মেয়েটি, পড়বে উঁচু ক্লাসে, বিলেতের মেয়েদের হারিয়ে দেবে সে। কিন্তু রমাপদর 'আমি একটি সাধারণ মেয়ে' গল্পের সাধারণ মেয়ে স্বপ্ন দেখে না কোনো, শুধু তার সাধারণ জীবনের অতি সাধারণ যন্ত্রনাটুকু ফুটিয়ে তোলে। প্রশ্ন রেখে যায়, সমাজে আবহমান প্রচলিত ধারা সম্বন্ধে।

শ্বশুরবাড়িতে বাড়ির বৌকে সমস্ত কাজ করতে হয়, মন জুগিয়ে চলতে হয় সকলের । ক্রমাগত সাংসারিক কাজকর্মের চাপে নিজের রঙ যখন ম্লান হয়ে যায়, সে নিজে যখন রোগা হয়ে যায়, তখন সেই বৌটিই নিজেকে সাজিয়ে তোলে, স্বামীর কাছে চলনসই করার জন্য, স্বামীকে ভালো লাগাবার জন্য। কিন্তু বাবার বাড়িতে এসে সেই বৌটিই তার বৌদির দিকে চোখ তুলেও দেখে না, তাকে সামান্যতম সাহায্যও করতে চায় না। যদিও সে দেখে বৌদির রঙ আগের চেয়ে খারাপ হয়ে গিয়েছে, ম্লান-পাংশু-বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে সে। সে নিপায়, কেননা "একটু বিশ্রাম না নিলে শ্বশুর বাড়িতে আবার কাঁধে জোয়াল তুলে নেবো কি করে?" কিন্তু বাপের বাড়িতে বৌদির যা ভূমিকা, শ্বশুরবাড়িতে তার ভূমিকাও ঠিক ততটুকুই— এই সাধারণ সত্যটুকু উপলব্ধি করার মতো সময় বা সামর্থ্য তা যেন নেই, অথবা থাকলেও সে যেন তা হারিয়ে ফেলেছে। " ভেবে দেখবো কি করে, তখন যে আমি সাধারণ মেয়েদের মতোই আর একটি সাধারণ স্বপ্ন দেখেছি ! যা সবাই দেখে।"

মানুষের মধ্যবিত্ত সুলভ স্বার্থবোধ নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে রমাপদর আর-ও অন্যান্য গল্পেও । আমরা প্রতিনিয়ত উপকারনি; সেই উপকারের পরিবর্তে যে কৃতজ্ঞতা, উপকারীর প্রতি যে সহানুভুতি অত্যাবশ্যকীয় সেই উপকার স্বীকার করি কি? আমরা ক্রমশই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছি, ব্যক্তিগত সুখকেন্দ্রিক এক আচ্ছন্নতায় অবসিত হচ্ছি এবং ক্রমাগত হীনতার নিম্নস্তরে অবনত হচ্ছি। আরতাই অপরাধবোধের স্বীকার এবং উপকারকে অস্বীকার — দুই প্রতিস্পর্ধীয় দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে দেখা দিচ্ছে। একই ব্যক্তির মধ্যবিত্ত সুলভ মানসিকতার ভয়াবহ পরিবর্তন 'আমি ও আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া' গল্পটির অবলম্বন। সদ্য বিবাহ করার পর স্বামী-স্ত্রী বেড়াতে গিয়েছে পুরীতে। স্নান করছে সকলে, স্নান করবে তারা — নুলিয়াকে স্বামী প্রত্যাখ্যান করেছে, কেননা নিজেরাই স্নান করতে পারবে তারা । স্বামীর বীরত্ব ব্যর্থ হচ্ছে, ডুবে যেতে বসেছে সে, সুতরাং স্ত্রী উন্মাদের মতো হয়ে অশ্রুসজল নেত্রে নুলিয়টিকে সর্বস্ব দিতে চাইল, সেই মুহূর্তের একমাত্র হাতের সম্বল হাতের বালা দু'গাছি গুঁজে দিয়ে নুলিয়াকে অনুরোধ করল তার স্বামীকে বাঁচাতে। স্বামী বেঁচে গেল, নুলিয়াটিই বাঁচিয়ে দিয়েছে, তখন স্ত্রী ভাবছে নুলিয়াটির কাছে তার বালা দুটির পৃথক কোনো মূল্য নেই, বালাও যা, চুড়িও তাই। তাছাড়া বালা দূ'গাছি দিলে তার মা, বড়ো জা'রা হয়ত বকাঝকা করবে। তারা যে তাকে বড্ডো ভালোবাসে। এরপর কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, সুতারাং কৃতজ্ঞতার গাঢ়তাও ফিকে হচ্ছে। বিবাহের পূর্বে তার দিদি বারবার সতর্ক করেছিল যে, শত অনটন সত্ত্বেও গয়নাগুলো নষ্ট না করতে । অর্থাৎ নুলিয়াটিকে টুড়ি দেওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। বরং একটি আংটি দেবে । তাছাড়া ওরা সরকারের কাছ থেকে রীতিমতো অর্থ পায়। তাই মুক্তা বসানো এবং জামাইবাবুর দেওয়া আদরমেশানো আংটি বাদ দিয়ে অন্য একটা কমদামী যে কোনো আংটি তাকে দেওয়া যেতে পারে। অবশেষে, কলকাতায় ফিরে যাবে তারা। সুতরাং, জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদার ব্যাপার আছে। চিনি, টুথব্রাশ, পাউডার, সেভ করার সরঞ্জাম— সমস্তই মনে ক'রে গুছিয়ে নিল। আর এসব করতে গিয়ে সামান্য নুলিয়াটির কথা যে ভুলে যাবে তাই ত' স্বাভাবিক! সবশেষে বাড়িতে ফিরে এসে জা-এর কাছে আস্ফালন! নুলিয়ারা সমূদ্রে স্নান ক'রে মাত্র দু'-আনা পায়। "..... আমি আসবার সময় কিন্তু একটা টাকাই বকশিশ দিয়ে এসেছি।" এবার guilty-feeling-এর পালা। এবং মধ্যবিত্তসুলভ বিপক্ষ যুক্তি খাড়া করা। ভাবা সত্যিই বালা দুটি দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল কি না। তাছাড়া তখন মানসিক অবস্থা ভালো ছিল না, ভালো থাকার কথা নয়— কাজেই অনেক কিছুই বলা হয় সে সময়। বলার অপেক্ষাও হয়ত রাখে নি সে, তার অ

াগেই হয়ত' সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সর্বোপরি, সরকারের কাছে টাকা পায় ওরা, কেউ ডুবে গেলে বাঁচানোই এদের ক াজ।

''এসব কথা বিশ্বাস করার মতো লোকের যেমন অভাব নেই তেমনই অভাব নেই অবিশ্বাসীদেরও। এটাও একধরনের নীতি।

৩. রমাপদ একধরনের গল্প লিখেছেন স্থান-নামের সঙ্গে প্রচলিত অনুষঙ্গ জুড়ে দিয়ে কল্পনাকে মিশ্রিত ক'রে ! (যেমন— 'দরবারী', 'ঝুমরা বিবির মেলা'ইত্যাদি)। এই সমস্ত গল্পগুলিতে উপস্থাপিত পরিবেশ সত্য। কিন্তু গল্পের চরিত্রগুলি অধিক াংশ ক্ষেত্রেই লেখকের কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু তাহলেও , তিনি এমনভাবে সেই কাল্পনিক কাহিনীকে ও কাল্পনিক চরিত্রকে পরিবেশ ও স্থানের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন যে সে গুলি রূপকথার মতোই রহস্যময়। যদিও এই সমস্ত গল্পে মনস্তত্ত্বের জটিল কচকচি নেই, তবুও কোথাও - কোথাও প্রকাশিত হয়েছে মানুষের নীচতা তথা পাশবিক স্বভাবের পরিচয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গল্পগুলি নাগরিক জীবনের পটভূমিকায় রচিত নয় ।নগরের বুদ্ধিজীবী মানুষ ব্যতিরেকেও গ্রামে বা অনামী মফস্ বলের মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা আছে, সজীব চাঞ্চল্য আছে— তারই পরিচয় দিতে চেছেছেন গল্পকার। প্রতিদিনকার সংসারের বা জীবনের এক-ঘেয়েমির মধ্যে নানা ক্লান্তিকর খাটাখাটনির মধ্যেও , শ্রমজীবীমানুষের ভালোবাসার ক্ষেত্রেও রোমান্টিকতা প্রকাশিত— গল্পগুলিতে তার প্রমাণ মেলে।

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত সময়বিশেষে সর্বধর্মের ক্ষেত্রেই ঘটে— সে হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীস্টান যাই হোক-না-কেন। সংস্কার যখন তীব্রমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করে তখন ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। গোঁড়ামী বা সংকীর্ণতা প্রকৃতধর্মের অন্তরায়,মানবধর্মের হানিকর । ''অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,/যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী অ াজ চোখে দেখে তারা;.....'' আর তাই যথার্থ মানুষকেই ট্রাজিক নায়ক হতে হয়। 'দরবারী' গল্পে জোনাথন ম্যাকক্লাস্কি অখ্যাত রেলস্টেশন লাপড়ার অনতিদুরে পাহাড়ের গায়ে বিঘে কয়েক জমি কিনে একটা বাড়ি ক'রে ফেলেছিলেন। পাগলা ম্যাকু সাহেব পাশের মুন্ডা পল্লীতে গিয়ে মহুয়া খেয়ে আর তাদের সঙ্গে নাচগান ক'রে বেশ আপন ক'রে নিয়েছিল তাদের। শুধু তাই নয়, মুন্ডাকন্যা শোনিয়াকে ভালবেসে বিয়েও ক'রে ফেলেছিল। কিন্তু পাগলা সাহেবের পাগলামি নিছক পাগলা মি থাকল না যখন উন্নাসিক ক্যাসল, ব্রাউন প্রভৃতিরা সেই পাহাড়ের ধারেই এসে জুটলেন স্থায়ীভাবে, গির্জা করলেন এবং একে -একে ''অশিক্ষিত হিদেনদের অন্ধকার থেকে আলোতে আনতে'' তৎপর হয়ে উঠলেন। কিন্তুকলোনীতে সহসা দেখা দিল অস্থিরতা, যখন জোনাথন-পুত্র ম্যাক ইভা হাগিন্সের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মাকে ঘৃণা করল। মুন্ডাপল্লীতেএকথা প্রচারিত হলে তাদের সর্দার বললে '' শোনিয়ার বেটার মুখে থু দিয়েছে উয়ারা। আমরা উদের কাঁইটা সাফ করবো বটে।'' অন্যদিকে কলোনীতে যুদ্ধের তৎপরতা শু হল। স্টেশনমাষ্টার রজনীবাবু মিলিটারী পাঠাবার জন্য বরকাকানায় ফে ান করলেন। কিন্তু মিলিটারী পৌঁছানোর আগেই ভোরের প্রার্থনা জানাতে এসে রেভারেন্ডব্রাউন আবিষ্কার করল ম্যাককা স্কিআর শোনিয়ার মৃতদেহ। ব্রাউনের মতে ম্যাককাস্কি ' ট্রু-খ্রীষ্টান', তাই বজ্রগম্ভীর স্বরে বাইবেল পাঠ করল সে, কলোনীর সকলে তার ফিনারেলে যোগ দিল, মুন্ডাপল্লীথেকেও স্ত্রী-পুষ সকলে এল। সর্বত্র শান্তি ফিরে এল, সকলের অনুমতিতে ল াপড়ার নাম বদলে জোনাথনের নাম অনুসারে হল ম্যাককাস্কিগঞ্জ । ''কিন্তু গির্জার দরজা থেকে অলটার অবধি দুটো রক্তের রেখা পাশাপাশি কি করে আসতে পারে এ প্র কারো মনেই উদয় হলো না।'' রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বড়ো' ইংরেজ আর 'ছোটো'ইংরেজের কথা। এই গল্পেও যথার্থ অন্তরের অধিকারী প্রকৃত মানুষ ম্যাককাস্কি জানতেন— ''ডিজিজ, ইমমরালিটি, ইনসেস্ট— এরই তো ক্যারেকটার হয়ে কলোনী পিপ্‌লকা।'' অন্যদিকে সংকীর্ণ ব্রাউন, হৃদয়হীন ব্রাউন, ছোট 'আমি' যুক্ত ব্যক্তি ব্রাউন স্বার্থবোধ ও সংস্কারকেই বড় বলে মনে করত— ''দি মুন্ডাস আর ত্রিশ্চানস অনলি ইন নেম্।'' গল্পের শেষে গল্পকারের যথার্থ অভিমত ঃ ''শান্তির দূত যীশুর গরিমা প্রচারের জন্যেই তো যুগে যুগে হিংস্র ক্রুসেডারদের অভিযান। ঈশ্বরের পুত্র যেসাসের ক্ষমা আর অহিংসার ধর্মকে পবিত্র করে তুলতে রেভারেন্ড ব্রাউনের হাত কতটুকু বা লাল হলো। তার বদলে ঈশ্বর লাপরার মাটিকে আলো দেবেন অনেক বেশী।'' এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে সুবোধ ঘোষের 'চতুর্থ' পানিপথের যুদ্ধ' গল্পের কথা। সুবোধ ঘোষের গল্পটি কথকের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে রচিত। রমাপদর গল্পটি Omniscient রীতিতে রচিত। তাহলেও, সুবোধ ঘোষের গল্পে সিফেন পরাজয় মেনে নিতে পারে নি।, অনুতাপে বনবাসে চলে গিয়েছে। দুটি গল্পেই আপাত সভ্য সমাজের ক্রুরতা, নিষ্ঠুরতা ও কদর্যতা প্রকাশিত হয়েছে। যাইহোক, রম াপদর মতে, তাঁর গল্পটি কাল্পনিক। কিন্তু কল্পনার বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রেই চারপাশের ঘটে যাওয়া বাস্তবতার চেয়ে বেশী

সত্য হয়—যদি সেই কল্পনা একজন প্রকৃত সাহিত্যিকের হয় ।

শুধু আপাত সভ্য সমাজের শরিকদের আচরণেই কুৎসিত নৃশংসতা ও অসূয়া নেই আপাত অসভ্য সমাজেও রয়েছে সেই-ই আচরণ। বাইরের নোংরামিকে আড়াল করতে চায় না তারা, বরং ভিতরের নীচতাকে আরো প্রকটভাবে তুলে ধরে। মাধো সোরেনের মেয়ে রূপমতী খাদানে কুলিকামিনের কাজ করত, লালোয়া কুখের সঙ্গে গল্প করত, স্থির করেছিল দুকুড়ি টাকা জমলেই চলে যাবে কুমান্ডির খাদানে, দুজনে মিলে বাঁধবে বাসা ('রেবেকা সোরেনের কবর') । কিন্তু ফার্ণহে য়াইটের ছেলে বাউন্ডুলে ম্যাকু সাহেব ছায়ার মতো ঘুরতে চায় তার সঙ্গে। একদিন ভিখারিয়ার আসরে রূপমতীর নামে গান বাঁধলে লালোয়ার দল আর ভিখারিয়া অর্থাৎ গায়েনের দলে দাঙ্গা বাঁধাল। সেই দাঙ্গায় ম্যাকু বাঁচালো র ূপমতীকে, লালোয়ার একটি হাত নষ্ট হল চিরকালের জন্য। চুন্দু হাঁসদার নেতৃত্বে পঞ্চায়েত বসল— বিচারে 'বিটলা' ক'রে দেওয়া হল রূপমতীকে। অসহ্য ঘৃনা আর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে রূপমতী ম্যাকুর প্রস্তাব মেনে নিল, তাকে বিয়ে করল, খ্রীস্টান হল সে রূপমতী নাম বদলে হল রেবেকা। ইতিমধ্যে ফার্ণহোয়াটের চাকরী গেল, স্থির হল বাঙ্গালোরে চলে যাবে তারা। পার্সিভাল ম্যাকুকে জুটিয়ে দেবে রেলের চাকরী, বিনিময়ে সিলভিয়াকে বিয়ে করবে ম্যাকু। আর র ূপমতী! চৌকিদারের ঘরে স্থান হল তার, যাবার আগে তার কান্নাভরা চোখ মুছিয়ে দিল ম্যাকু, হাতে গুঁজে দিল একগুচ্ছ নোট । আর ফিরে এল না সে। নতুন সাহেব পেরেরা 'সান্ডাল মেয়ে' রূপমতীকে তাড়িয়ে দিল, সই সোনামি খাদানে কুলিকামিনের কাজ করতে বারবার অনুরোধ করল, লালোয়া বাসা বাঁধবার আশায় আবারও দেখা করতে এল তার সঙ্গে; কিন্তু, রূপমতী ম্যাকুর আশায় বসে রইল, খাদানে কাজ ক'রে স্বামীর মান-ইজ্জত নষ্ট করতে চাইল না। দিনে দিনে, তিলে-তিলে আয়ুহীন হল রেবেকা, অবশেষে একদিন মৃত্যুও ঘনিয়ে এল। মৃতদেহ মাটির ঢিবির তলায় নামিয়ে দিয়ে সকলেই ভুলে গেল তার কথা, রূপমতী যেন হারিয়ে গেল।

হ্যাঁ, এই গল্পেই লেখক রমাপদ মুন্ডা-ওঁরাও প্রভৃতি আদিবাসী-অসংস্কৃত সমাজের অন্তর্গত মানুষদের তীব্র সংস্কারকে তুলে ধরতে চেয়েছেন পাঠকদের সামনে। পঞ্চায়েতের শেষ বিচার 'বিটলা'— যার ফ ল পলকের পর পলকে নিঃশেষ হয়ে য াওয়া— কেউ কোনো সাহায্য করবে না, কথা পর্যন্ত বলবে না, খেয়ে পরে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকতে দেওয়া তো দুরের কথা, টাকা-পয়সা দিলেও জীবন ধারনের জন্য, টিকে থাকার জন্য সামান্য চাল-তেল- লবনও দেবে না কেউ। উপরন্তু সমস্ত গ্রামের "মেয়েরা ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করে থাকবে", পুষেরা দলে-দলে বাঁশি আর মাদল বাজিয়ে ঘিরে ধরবে তাকে, আরেক দল আসবে তীর-ধনুক নিয়ে। অশ্লীল গান আর ঠাট্টা- বিদ্রুপ করবে তাকে উদ্দেশ্য ক 'রে, কেড়ে নেবে লজ্জা নিবারণের যৎসামান্য বস্ত্রখানিও ।

আসলে, এদের অশ্লীলতা, নোংরামি ও অভদ্র ইতরতার ভয়াবহতা রমাপদর মতো একজন গল্পকার খুব কাছে থেকেই দেখেছিলেন। আর কেবল সেইখানেই তিনি থেমে থাকেন নি, পাশাপাশি রূপমতীর মতো কুলিকামিন মেয়ের ব্যক্তিত্বও ত াঁর নজর এড়িয়ে যায় নি। অসংস্কৃত সমাজে পুষ প্রাধান্য প্রবল; ধর্ম-সংস্কার, পাপ-পুণ্যের বুজকি নারীর উপর অত্যাচারের সুলভ উপায় মাত্র। এই সত্য রূপমতীর মতো মেয়েও বোঝে—"যে লোকগুলো এত ধরম অধরমের কথা বলছে, ও জানে এরাই এসে ইজ্জত কাড়বে ওর।" তাই সে ম্যাকু সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতার বশে লালোয়ার অনুরোধ অনুনয়েও অসম্মতি জ্ঞাপন করে, তিলে-তিলে মৃত্যুকে বরণ করেও তার স্বামীর ইজ্জত বাঁচাতে চায়। অন্যদিকে ম্যাকু সাহেবের মতো তথ াকথিত ভদ্র মানুষদের খামখেয়ালিপনা, অবিবেচনা তথা অমানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে ঃ "কিন্তু দিন কয়েক পরেই যখন ডে ারার সঙ্গে সিলভিয়াও এসে পৌঁছালো, ম্যাকুর হঠাৎ মনে হলো বাবার কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়।

রমাপদর আরও অন্যান্য গল্পেও প্রকাশিত হয়েছে আদিবাসী মানুষদের ডাইন ফোকসিন প্রভৃতিতে অন্ধবিশ্বাস। দৃষ্টান্ত হিস াবে তুলে ধরা যায় 'ঝুমরা বিবির মেলা' গল্পটিকে। অবশ্য, গল্পটির অন্য মাত্রা বৃদ্ধ পিতার সন্তান স্নেহের দিকটি। ঝুমরা বিবি ও তার মেয়ে আসমিনাকে ডাইন সন্দেহে তুডুক চাষীরা প্রচন্ড মারধর ক'রে গ্রামের বাইরে বের করে দিয়েছিল, বে-আব্রু করেছিল তাদের, পয়সা দিলেও এক কণা চাল পেত না তারা। মা-মরা-ছেলে, বাবার অন্ধ স্নেহে বেড়ে ওঠা বুধন ড াকাত হয়ে লুটের চাল-ডাল-সোনা যা পেত তাই-ই দিত মা-মেয়েকে; মাতাল বুধন আসমিনার সঙ্গে রাত কাটাত। "বেটী পাড়ায় পানি আনতে গেছে শুনে টাঙ্গিটা লিয়ে চলে গেল বুধন।" হত্যা করল তাকে। বুধন ডাকাতি ছেড়ে চাষবাস করবে প্রতিশ্রুতি দিলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নকল বুধনের মৃতদেহ নিয়ে হাজির হল তার পিতা বুড়ো মিঞা। বলল লঁটকে দে

অর্থাৎ ফাঁসি দে। কিন্তু ফাঁসি না হলে, শুধুমাত্র বছর চারেক জলে হওয়ার পর ছাড়া পেলে নিজেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ল।

কী প্রবল অন্ধ সংস্কার, কী আশ্চর্য দৃঢ় বিশ্বাস! বৃদ্ধ মিঞার অন্তরের গভীরে এই প্রত্যয় প্রোথিত যে ঝুমরা ডাইন তারা অপরের কলিজা বের করে খায়। সে আরো বিশ্বাস করত খুনের দায়ে ফাঁসি হলে পিতার কলিজা পুত্রের বুকে প্রবিষ্ট হবে, সে সৎ হয়ে উঠবে। সুতরাং বৃদ্ধ পিতার অপত্য স্নেহ ও তো এই গল্পের অন্যতম দিক। আবার ঝুমরা বিবির কথা না হজুর ডাইন নই আমি---তার তীব্র অসহায়তার দিকটিকেই ব্যঞ্জিত করে। মনে পড়বে এর বহুপরে লিখিত রমাপদর উত্তরসূরী অভিজিৎ সেনের একটি গল্পের কথা।৫ সেখানে এক নারীকে ডাইন সন্দেহে হত্যা করতে চাইলে নির্মমভাবে আহত হয়ে জেহাঙ্গীর বারংবার বলে উঠেছে যে সে নিজে ডাইন, যদিও ডাইনে তার আস্থা আছে, তার বিশ্বাস তার শাশুড়ীই ডাইন ছিল। জেহাঙ্গীর নিজের কথা ঃ"হ্যাঁ, ডাইন মানুষকে এমনভাবে খায় যে সে মানুষটা টেরও পায় না। তারপর একদিন শুকিয়ে অথবা গলা থেকে রক্তবমি করে অথবা অন্য কোনো রোগে ভুগে সে মরে যায়!"

ইতিহাসসম্মত কিছু সত্যের বিবরণ রয়েছে রমাপদ রচিত গল্পটিতে । ভারতবর্ষের অসংস্কৃত ও দারিদ্রপীড়িত জনবসতির মধ্যে রয়েছে মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয়—"বোধ হয় কোনো প্রাচীনকালে তুর্কী সৈন্যের আগমন ঘটেছিল এই অরণ্যাঞ্চলে, অ ার সেইজন্যই মুসলমানদের নাম হয়েছিলো তুড়ুক। যেমন হিন্দুদের নাম ছিল দেকো। ..... অবশ্য নামেই তুড়ুক, আচার বিচারে সিকি ভাগ মুসলমানী,বারো আনা সাঁওতালী।..... দেবদেবী সেই কিঁসাড় বোঙা, হারাম বোঙা, রামসালগি লিট া, জয়শিম বোঙা।..... ওপারের লোক যেমন বলতো সবচেয়ে বুড়া হল সিঙে বোঙা, তেমনি তুড়ুকদের সবচেয়ে বড় দেবতা এল্লা বোঙা।" অথবা, ঝুমরা বিবির মেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে কাল্পনিক ঘটনার সংযোজনের পর সেই মেলার পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে—"এখনো শীতকালের দিনে সারা গাঁয়ের লোক মেলা বসায়— ঝুমরা বিবির মেলা।..... চ ারপাশের লোক ছড়া বাঁধে, গান গায় ঝুমরা বিবি আর মিঞা সর্দার নামে। এল্লা বোঙার পূজোদিয়ে একটা মোরগের ন াম দেয় ঝুমরা আর অন্যটার মিঞা সর্দার—তারপর দুজনেরই পায়ে ছুরি বেঁধে ছেড়ে দেয়।...."

টোটেম টাবু সংস্কার ছড়ানো শুধু মেট্রোপলিটন নগরী, আধা মফস্বলী মানুষের মনে হয় প্রত্যন্ত গ্রাম - বাংলার মানুষের মধ্যেও রয়েছে তা। ডোমদের যশাই সিদ্ধপুষ হয়ে বাঁকুড়া রায়ের উপাসক হয়েছে 'সতী ঠাকণের চিতা' গল্পে। উচচ গম্ভীর স্বরে ধর্ম ঠাকুরের মন্ত্র পাঠ করত সে। অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্জের কন্যা কল্যাণী এসে সাহায্য করত তাকে। ব্রাহ্মণ কন্যা যাবে ডে ামের আখড়ায়! অশীতিপর এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দিলেন বাড়ুজ্জে মশাই। বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যু হলে কলঙ্কময়ী কল্যাণীকে নিয়ে যাওয়া হল চিতাতে। কেননা সতী করবেন তাকে । যশাই ছুটে এল, কল্যাণী বাঁধন খুলে দিল, তার ধর্মঠাকুর মিথ্যা নয়, চিতা থেকে মৃত উঠবে জীবিত হয়ে। সারারাত মন্তর প'ড়ে যখন তার নিষ্ফলতা অনুভব করল যশাই, তখন শপথ করল ব াঁকুড়া রায়ের পুজো আর সে কখনো করবে না। তারপর বহুদিন নিদ্দেশের পর গ্রামে ফিরে সব ধর্মঠাকুরকে জলে ফেলে দিল সে, এবং মূহূর্ত কয়েক পরে কেবল যাত্রাসিদ্ধির মুর্তি তার হাতে ঠেকলে মনে হল,সব মিথ্যা, কেবল যাত্রাসিদ্ধিই সত্য। ধর্মঠাকুর যাত্রাসিদ্ধির প্রতিষ্ঠা করল সে। কিন্তু কল্যানীকে সে ভোলে নি, তাই জ্বলন্ত চিতা দেখলে আজও সে সহ্য করতে পারে না, ব্রাহ্মণদের মন্ডপে প্রবেশ করতে দেয় না। মৃত্যুর পর তাকে যেন চিতায় পোড়ানো না হয়— এই তার নির্দেশ। সতীদাহের কুপ্রথার বিদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী তো সেই-ই। এইভাবেই জনশ্রুতি, প্রচলিত আখ্যান, লোকাচার প্রভৃতিকে কল্পনার সমবায়ে স্বভাবের সঙ্গে মিলিয়ে একটি গল্প গড়ে তুলেছেন রমাপদ।

৪. রমাপদ গ্রামজীবনের পটভূমিকায় লেখা গল্পগুলিতে তুচ্ছ-বিড়ম্বিত উপেক্ষিত নারী পুষের উদারতা প্রকাশিত হয়েছে। আবার বড় হয়ে উঠেছে গ্রাম্য রাজনীতি, এক ধর্মের মানুষের আর এক ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার অভাব ইত্যাদি। তাই 'নকলচি' গল্পে কাসেম আলীর তৈরী পুঁথিই যখন হিন্দুদের ঘরে ঠাঁই পায় তখন সে আর তা স্পর্শ করার অধিকার পায় ন া এবং ধরা পড়লে গণপ্রহারে তার মৃত্যু হয়। এ হল হিন্দু সমাজের সংকীর্ণতার দিকটি । আবার ভালবেসে হামিদাকে বিয়ে করতে চাইলে তার পিতা মৌলবী সাহেব হিন্দুদের দেবদেবীর গান করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং 'কাবান' লিখে নেয়। মুসলমান সমাজের এই গোঁড়ামীর দিকও কোনো অংশে কম ভয়ংকর নয়। একইভাবে, 'তালাক' গল্পে কাশেম ভ ালবাসে চাঁদবানুকে তাঁর জন্য গরীব কাশেম স্বপ্ন দেখে, দীন হলেও সে হীন নয়, কুড়ি তার কাছে বড় কম নয়, অনেক

অনেক বেশী, তবুও কুড়ি টাকার লোভেও সে তালাক বিত্রি ক'রে ইজ্জত নষ্ট করতে চায় না।
চাঁদবানুর রঙিন জলচুড়ি আনতে গিয়ে জলসাপে কামড়ায় তাকে, ডান হাতটা চিরকালের জন্য দিয়ে দিতে হয় । ফিরে এসে দেখে, লতিফ সাহেবের তৃতীয় বিবি হয়েছে চাঁদবানু। হাতকাটা কাসেমের সঙ্গে চাঁদবানু কথা বললে কাশেমের কাজ যায়, চাঁদকেও তালাক দেয়। অবশেষে তালাক দেওয়া বিবি চাঁদকে লতিফ ফিরিয়ে আনতে চাইলে তালাক বিত্রি করতে র াজী হয় কাশেম। যদিও অশ্রুসজল কণ্ঠে চাঁদবানু কাশেমকে তালাক বিত্রি না করতে অনুরোধ করে । কিন্তু, কাশেম জানে, 'গলার হার গলায় তুলে দিয়েছে কাশেম। সেই স্বপ্ন, তো সবচেয়ে মিঠে, কি হবে তাকে দেয়ালের বাক্সে ভরে রেখে।" কেননা, কাশেম জানে, সে যে গরীব, সে যে চাঁদের যোগ্য নয়। গল্পে সংস্কার তীব্র মাত্রায় প্রকাশিত । তাই চাঁদের বাবা চ াঁদকে অন্য কারো হাতে তুলে দেবে না, লতিফের তৃতীয় স্ত্রী করবে তবুও লতিফ অবস্থাপন্ন ধনী ব্যক্তি তাই ব্যভিচারে পারঙ্গ ম । আবার গরীব কাশেমের রোমান্টিকতা ও উদারতাও প্রশংসনীয়।

৫. যুদ্ধের পটভূমিতে গল্প লিখেছেন রমাপদ। প্রচলিত জীবনের মূল্যবোধগুলি যুদ্ধের তান্ডবে বিপর্যস্ত । একদিকে মুষ্টিমেয় মুনাফালোভী ও দাঙ্গাপ্রিয় মানুষের দানবীয় উল্লাস; অন্যদিকে ব্যাপকসংখ্যক মানুষদের ভয়াবহ আতঙ্ক । সাধরণ মানুষ যেন কোনো নিষ্ঠুর ক্রুর কোন শক্তির খেলনা সামগ্রী, তাকে যেন টোঙা গেঁথে খেলিয়ে নিয়ে বেড়ানো যায়, তাদের জীবনের মূল্য যে কত কম— এই গল্পগুলি পড়লে তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়।
প্রায় তিনটি ঘটনার সংযোজনে গড়ে উঠেছে 'তিনটি প্রা গল্পটি। তবে ঘটনাগুলি বিভিন্ন সময়ের হলেও তাদের মধ্যে যে াগসূত্র রয়েছে। সুত্রটি হল নারীর নিরাপত্তার অভাবের দিকটি এবং একই সঙ্গে মধ্যবিত্ত চরিত্রের নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা, অপরের বিপদে মাথা না ঘামানো কিংবা তার অসহায়তার দিকটি। যুদ্ধের সময় দাঙ্গা পরবর্তী নিঃশব্দ নির্জন কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে সঙ্গীহীন অবস্থায় পরিচিত এক প্রকাশক বন্ধুর সঙ্গে কথক কথাবার্তায় তুফান উড়িয়েছিলেন—দাঙ্গা কারো উপকারে আসে না। অথচ, কিছুপরে এক নারীর আর্ত চিৎকারে শুধু অসহায় দুষ্টিতে যন্ত্রবৎ তাকানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন নি তাঁরা। দ্বিতীয় ঘটনাটিতে ডাক্তার বন্ধু নিরঞ্জন বাস থেকে নেমে পড়েছিলেন এক নারী-কণ্ঠের আর্তনাদে। অথচ, সেই নিরঞ্জনই কথা মতোশ্বশুর বিলেত পাঠাতে না পারায় এক স্ত্রী ত্যাগ ক'রে দ্বিতীয়বার বিবাহে উদ্যোগী হয়। স্ত্রীর আর্তনাদ কি সুবিধাভোগী বন্ধুর কানে প্রবেশ করে নি? যেন ব্যঞ্জনাময় এই প্রশ্ন দ্বারাই শেষ হয়েছে ঘটনাটি । আর তৃতীয় ঘটনায় স্বয়ং কথক ও তার বন্ধুরা মেদিনীপুরের এক গ্রামের মজলিসে তাস খেলতে বসে হৃদয় ঘোষের বৌমার তীব্র অ ার্তনাদ যেন শুনেও শোনেন নি। কিছু পরে কান্নার রোলে ভিড় জমিয়েছিলেন তারা, তখন সবশেষ—মারা গিয়েছে বৌটি। অর্থাৎ ঘটনা তিনটি তথা গল্পটিতে রয়েছে সামান্য অস্থিরতায় সুযোগসন্ধানী কর্তৃক নারীর অত্যাচারিত হবার ব্যাপারটি । একইসঙ্গে পারিপার্শ্বিক সমবেত জনতার নিষ্ঠুরভাবে গা বাঁচিয়ে চলার দিকটিও।

'গত যুদ্ধের ইতিহাস' গল্প পাঁচটি ভিন্নতর সময়ের ঘটনার সংযোজন রচিত। ১৯৪০ সালে যে নারী বাসে বাসে
ভিক্ষা করে, ১৯৪২ সালে সে-ই টুকিটাকি জিনিস বিত্রি করে এবং স্বামীর পাশাপাশি ঘোরে , ১৯৪৩ সালে শিশুপুত্রতে নিয়ে আবারওভিক্ষা করে। ১৯৪৪ সালে বর্বর মাতাল নেকড়েদের সঙ্গে মত্ততায় যোগ দেয়। ১৯৫০সালে চৌরঙ্গীর রাস্ত ায় একটি ছেলে তার পিতৃপরিচয়ে নৃশংস এক নিলিপ্তভাব পোষন করে। এইভাবেই সামান্য ঘটনা থেকে বহু অতীত চিত্র, অনেক 'ধূসর পান্ডুলিপি' ভেসে ওঠে আমাদের বুকের মাঝখানে এবং অসহায়ভাবে তা বয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না আমাদের ।
নারীর আর্তচিৎকার শুধু এই দুই গল্পেই সীমাবদ্ধ নয়, তার সহায় সম্বলহীন রূপ রয়েছে রমাপদর আরো অন্য গল্পেও । 'দুবার বাঁচা' গল্পে কথক এবং তার গোঁয়ার টাইপের মজবুত চেহারার বন্ধু সায়ন্তন লুটের শহর শহরলুটিয়ায় দু'দুবার ব াঁচিয়েছিল দময়ন্তীকে । স্বভাবতই দময়ন্তী কৃতজ্ঞ ছিল উভয় বন্ধুর প্রতিই। কিন্তু উভয়েই কৃতজ্ঞতা নয়, ভালোবাসা দাবি করেছিল, ভালোবেসে ফেলেছিল তাকে। কিন্তু তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের দীপ্তি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে । 'গত যুদ্ধের ইতিহাসে' গল্পে ভিখারী মেয়ের মধ্যেও এই ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট যা রমাপদর নিজস্ব পরিচয়কেই চিহ্নিত করে।

৬. রামাপদ একধরনের গল্প লিখেছেন ওঝা প্রভৃতি আধা পরিচিত মানুষদের নিয়ে। ওঝাদের নিয়ে যে জনমত ও সংস্কার আব
হমান অতীত থেকে প্রচলিত, সেই মতামত কতটা সত্য, তা কি বিশ্বাস করা যায়— এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে চেয়েছেন পাঠকের মনে, যদিও কোন নিশ্চিত সত্যে পৌঁছাতে চান নি তিনি। যুগযুগ ধরে প্রচলিত যে সংস্কার রয়েছে—সেই সংস্কারকে আঘাত করতে চান নি। বরং তার মধ্যেই ওঝাদের জীবনের যে কণ বিষন্নতা রয়েছে তাকেই পরিস্ফুট ক'রে তুলতে চেয়েছেন। তাই দেখি, লাল চাঁদ ওঝা, লাটুয়াওঝা প্রভৃতিদের নিয়ে রচিত গল্পে ওঝাদের জীবন যাত্রা তথা জীবনের অন্তিম পর্যায়ের সহায়হীনতার দিকটিই বড় হয়ে উঠেছে।

লাটুয়া ওঝা একসময় সাঁওতাল সমাজের খুব বিশ্বস্ত ও ঈশ্বরতুল্য ওঝা ছিল। কিন্তু যুগবদল হয়েছে, ওঝার স্থানে এসেছে ডাক্তার। তাই সাঁওতালরা তার কাছে আর ভিড় করে না, ভিড় জমায় হাসপাতালে । কুকুরে কামড়ালে নিছকই ঔৎসুক্যে লাটুয়ার বাড়ি গিয়ে দাওয়া নিয়ে এসেছিলেন কথক। পরের দিন কৌতূহলের বশে লাটুয়াকন্যা সুরমনির কাছে জানতে চাইলেন কী ক'রে চলে তাদের। আর তখনই যাবতীয় রহস্য উন্মোচিত হয়ে গেল । লাটুয়ার জীবন ধবংস হয়ে যায় ভালুকের হিংস্র আক্রমনে অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই। কিন্তু মেয়ে সুরমণি পিতাকে সান্ত্বনা দিতে যথাসম্ভব আড়াল ক'রে চলে তাকে। গাছের মূল চেনে না সে, জানে না কিছুই, এই কারনেই যা পায় তা-ই নিয়ে এসে রেখে দেয় বাবার মন বোঝানোর জন্য। স্বভাবতই, দাওয়াই-এ কাজ হয় না, রোগ ভাল হয় না, ওঝা লাটুয়ার সহায় সম্বলহীনতা, তার কাণ্যের দিকটি পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে। লাটুয়া দেহে বেঁচে আছে, মনে মারা গিয়েছে —জীবনের এই ভয়াবহ দিকটি শোচনা ও ভয়ের উদ্রেক করে আমাদের।

ওঝা লাল চাঁদের নিজস্ব প্রতিফলন ঘটেছে সবচেয়ে বেশী 'মন্ত্র' গল্পে। কথকের দিদিমাকে বাঁচাতে পারে নি লালচাঁদ, অসহায় উন্মাদের মতো চিৎকার করতে করতে ওঝা লাল চাঁদ মেনে নিয়েছিল যে বিষ নামানোর মন্ত্র মিথ্যা। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে সাপে কামড়ালে তাকে সেই ওঝাই সদরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেয় নি, স্বকীয় বিশ্বাসে বিষহরির মন্ত্র প্রয়োগ করতে চেয়েছে। কেননা সে জানে মনে-প্রানে মানে, এ মন্ত্র মিথ্যা নয়, মিথ্যা হতে পারে না। অর্থাৎ কোনো ভন্ডামী নয়, কোনো নিশ্চিত সত্যও নয়, অন্তরে প্রোথিত অভ্যাস, যা সংস্কারে পরিবর্তিত এবং বিশ্বাসে রূপান্তরিত— তারই গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। এই বিশ্বাসের চিত্রই দেখেছি, কিছুটা ভিন্ন মাত্রায় 'সতী ঠাকুণের চিতা' গল্পে।

৭. রমাপদর কিছু ছোটগল্পে রয়েছে কথকের অপরাধবোধের প্রকাশ। এই ধরনের গল্পগুলি 'আমি'র জবানীতে লেখা। উত্তম পুষের লেখা এই ধরনের গল্পে রয়েছে লেখকের স্মৃতি মেদুরতা। সেখানে রয়েছে একধরনের আচ্ছন্নতা। রমাপদ এখানে যেন পূর্বে ঘটা ঘটনা, যার সঙ্গে কথক সংযুক্ত এবং কিছুটা অপরাধীও — সেই অপরাধবোধকে (guilty-feeling) -ই প্রকাশ করেছেন। এই ধরনের গল্পের শুটি ও অতীব চমৎকার! রীতিটি সম্বোধনাত্মক।এই শ্রেণীর গল্পে বেশীর ভাগ সময়েই পাঠককে সম্বোধন করেই শু করেছেন, শেষও করেছেন সম্বোধনের মাধ্যমেই ।

"হঠাৎ যদি আপনার কানের পাশে কেউ সে নাম ধরে ডাক দেয়, যদি কোন দিন তাকে খুঁজে পান, কোন দূরগামী ট্রেনের রাতের কামরায়, কিংবা কোন জনারণ্য শহরের অন্ধ গলিতে, আশ্রয়ের সন্ধানে যদি নিশীথ প্রহরের কড়া নাড়ে সে, অথবা ধন, দ্বিপ্রহরের ট্রেনে যেতে যেতে কোন ছোট্ট ইস্টিশনের ধারে প্লাটফর্মের বেড়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো কোনো মধুম্লান মুখ দেখে হয়তো বা আজকের এই বর্ণনার সঙ্গে মিল পাবেন ঃ এইটুকু আশা নিয়েই বলছি।"

গল্পটির শেষ হয়েছে এইভাবে—

"যদি খুঁজে পান অনুপমাকে, বলবেন, ভুলিনি, ভুলতে পারিনি আমরা । বলবেন, আমাদের অনুভূতি আছে, শক্তি নেই। বলবেন তাকে যে, অন্ধ কামনার আগুনে একটি ছোট্ট শিশুর প্রাণ পুড়ে ছাই হতে পারে, সে সত্য আমরা জেনেছি।" বিবিকরজ)

কিংবা অনেক সময়ই ভবিষ্যৎ কোন ঘটনার কল্পনা ক'রে নিজের সঙ্গে স্বগতোক্তিকেই প্রকাশ করেছেন যেমন—

"অণিমা সান্যালের সঙ্গে আমার আবার দেখাহবে। অনেক অনেক মিঠে বসন্তের মাঠ পার হয়ে এসে কোন এক অ াকস্মিকতার আলপথে আবার দেখা হয়ে যাবে অণিমার সঙ্গে।

গল্পের শেষটি —

"এই আনন্দের অভিনয়, খুশিয়াল আলোককণিকা ক্রমশ মিলিয়ে যাবে ওর মুখ থেকে, ক্লান্ত পান্ডুর ঘামে ভেজা একটি সুন্দর রোগশীর্ণ শরীর ক্রমশ বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে যাবে, বিছানার সাদা চাদরের রিক্ততায় একদিন অণিমার শীর্ণ রে াগজীর্ণ দেহ ঢাকা পড়বে, অসীমেন্দুর বসানো সেই ফুলের চারায় দোপাটি আর রজনীগন্ধা ফুটবে, সেই ফুল এনে অণিম াকে নতুন করে সাজিয়ে দেবো আমি, আর হাওয়াই শার্টের, কার্ডুরয়ের ট্রাউজারের, মোটা ফ্রেমের চোখের মনের খাত ায় লেখা হবে— অসুখ ঃ ঢিবি । কিন্তু আমি জানবো, মৃত্যু নয়, আত্মনিঃশেষ।" (তিতির কান্নার মাঠ)

পাঠকের মনে পড়বে যে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের তেলেনাপোতা আবিষ্কার গল্পের শু পাঠককে সম্বোধনের দ্বারা। রমাপদর এই শ্রে ণীর গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি নারী। এই নারী কথকের কোনো এক সময়ের পরিচিত, যাকে সাধারণ বলা যাবে না, অন্তত কথকের কাছে তিনি অসাধারণ ছিলেন। কোন এক সময়ের কথকের চিন্ত-ভাবনা স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্খা সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে ছিল এই নারী। কিন্তু ঘটনাচক্রে তার প্রতি যেন কিছু অবিচার করা হয়েছে— অথচ কথক প্রত্যক্ষত এর জন্য দায়ি নয়। কিন্তু যেহেতু কথকের সেই অতিপরিচিত প্রিয়তমা নারী শিকার হয়েছে সেই অবিচারের, তাই অপরাধের দায়ভার যেন তিনিই মাথা পেতে নিয়েছেন। এ যেন সেই ধরনের স্বীকারোক্তি, যেখানে কথক বলতে চাইছেন যে তাঁর হৃদয় ছিল তা আজও ফুরিয়ে যায় নি। অনুভূতিশীল মানুষ মাত্রেরই হৃদয় আছে অথচ ঘটে যাওয়া ঘটনাকে আটকানোর মত যথেষ্ট স ামর্থ্য তার নেই— যেন তার মত মানুষের কারো থাকে না ।

কোলিয়ারি জীবনের কালো ধোঁয়া মুছে ফেলার জন্যই আর্বিভুত হয়েছিল সতেজ-সবুজ- নবীন অনুপমা! সঙ্গে তার প্যার ালিসিসে বিকলাঙ্গ স্বামী এবং ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে মুন্নু। কোলিয়ারির কালো কুচকুচে ছেলে মেয়েদের দেখাশোনার দায়িত্বে কোন গাফিলতিছিল না তার, কিন্তু চাকরিতে নিষ্ঠা এবং দায়িত্ব পালন করলেই উপরওয়ালার মন পাওয়া যায় না, জেন ানার ইজ্জতে হাত বাড়ায় যে জেপিও সাহেব তারত পাওয়া যাবেই না— তাতে আর সন্দেহ কি। সুতরাং জেপিওর বিষনজর থেকে রক্ষা পেল না সে-ও । চাকরির রিপোর্টে অনুপমার নামে অভিযোগ এল সে নাকি অন্যদের বঞ্চিত করে নিজের মেয়েকে নিয়েই সদাব্যস্ত। হুকুম এল বেবিক্রেস তার মেয়ের জন্য নয়, মেয়েকে রেখে আসতে হবে কোয়ার্টারে। কথকের নিষেধ অগ্রাহ্য করলেন মান্যবর বড় কর্তারা। অবশেষে তাদের বিধানইশিরোধার্য হল মুন্নু থাকল বিকলাঙ্গ পিত ার কাছে। কথক, কমপাসবাবু, ডাকঘরের অবনী সময় মত দেখে আসত মুন্নুকে—সকলেই আটকে দিত ফটক। কিন্তু কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে ফটক দিয়ে বেড়িয়ে গেছে ছোট্ট চঞ্চল মুন্নু—খুঁজে পাওয়া গেল না তাকে। অনুপমাও চলে গেল তার 'সবুজ শোভা নিয়ে', 'ফা গুনের আগুন' নিয়ে।

গল্পটিতে কথক অনুপমকে ভুলতে পারেন নি, একাধিকবার প্রকাশ করেছেন তার অজ্ঞান অপরাধকে—

"বুঝলাম, আমাদের অনুভুতিই আছে, শক্তি নেই।"

"আজও সারা মন অনুশোচনার দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়ায় অনুপমাকে।"

'তিতির কান্নার মাঠ' গল্পটিতে আছে হোস্টেল সুপারিটেডেন্ট সান্যালের মেয়ে অনিমাকে ভালবাসত কথক। একই সঙ্গে ভ ালবাসত কথকের বন্ধু খেলাধূলায় চৌকোস অসীমেন্দুও। অনিমা অসীমেন্দুকে চায়, সুতারাং কথক অর্থাৎ সুনীত প্রত্যাখ্য াত। বহুদিন পর সুনীত লাইম ফ্যাক্টরির অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার আর অসীমেন্দু এখনও খেলাধূলা নিয়েই কাটায়। অণিকে কষ্ট দিতে পারবে না, তার জন্য সব করতে পারে সে। কিন্তু তবুও শুধু মাত্র বন্ধু বান্ধবদের আত্মীয় স্বজনদের উপহাস থেকে বাঁচার জন্য একটা কিছু করা দরকার— একটা চাকরির দরকার, সুতরাং বহুদিন পর ডাক পড়ল সুনীতের। চাকরি একটা পেলও সে। ঠিক হল বিয়ে হবে অণির সঙ্গে,সুনীতের মা সানন্দে বধুধরণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু দিন সাতেক পরে অসীমেন্দু একা একা ফিরে এল, অণির পরিচিত হাতের লেখা চিঠি হল— যে চিঠির বক্তব্য গোপনে রেখে দিল অসীমেন্দু। আর ত ারপর..... । তারপরে, অসীমেন্দু চলে যাবে, পুলিশের খাতায় লেখা থাকবে অ্যাকসিডেন্ট কিন্তু সুনীত জানবে" সাব ইন্সপেক্টর পান্ডে বলে গিয়েছিল অ্যাকসিডেন্ট নয় সুনীতবাবু, সুইসাইড।"

এই গল্পটিতেও কথকের guilty-geeling থাকার কথা নয়, কিন্তু ঘটে যাওয়া ঘটনার দায়ভার যেন তিনি অস্বীকার

করতে পারেন নি—
"আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠবে সেই মুহূর্তে। মনে হবে আত্মহত্যা নয়, অ্যাকসিডেন্ট নয়, অসীমেন্দুকে হত্যা করেছি, হত্যা করেছি আমি।"

৮. 'সিন্ধুসারস' কবিতায় জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন— 'জানি পাখি, সাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান,/তুমি পিছে চাহো নাকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই, বুকে নেই আকীর্ণ ধূসর/পাণ্ডুলিপি;" মানুষের সঙ্গে অন্য প্রাণীদের প্রধান পার্থক্য হল যে তার অতীত নেই, বর্তমান নেই, চৈতন্য নেই, বুদ্ধি নেই। এই চৈতন্যহীন বোবা প্রাণীদের নিয়ে গল্প লেখার যে ধারাটি বিশিষ্টতা পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথে, তা পরবর্তীকালে সমৃদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পে একটি শূকরের কথা আছে, যদিও তার কোনো নাম নেই। এর আগে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'বিসর্জন' নাটক লিখেছিলেন, তারও আগে লিখেছিলেন 'রাজর্ষি' উপন্যাস। সেখানেও একটি নামহীন ছাগশিশুর উল্লেখ আছে। তাঁর 'শুভা' গল্পে বাণীকণ্ঠের মূক কন্যা শুভার সঙ্গী ছিল দুটি মূক গৃহপালিত প্রাণী সর্বশী ও পাঙ্গুলি। রবীন্দ্র-পরবর্তী গল্পের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'গবিনসিংহের ঘোড়া', 'আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলি ', 'সুকু ও ভূকু', 'চিনু মন্ডলের কালচাঁদ', 'ডগি অ্যালশেসিয়ান নয়', 'কালাপাহাড়', 'কামধেনু', 'নারী ও নাগিনী', বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বুধির বাড়ী ফেরা', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঘিনী', প্রমথনাথ বিশীর 'নীলমনির স্বর্গলাভ', নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক', সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক' নামের গল্পটির কথা মনে পড়ে। অবশ্য 'অযান্ত্রিক' গল্পটি কোনো মূক পশুকে নিয়ে লেখা নয়, সেখানে আছে 'জগদ্দল', নামে এক মোটর গাড়ীর কথা, যে নায়কের এক যুগেরও বেশী সঙ্গী ছিল,। এই সমস্ত গল্পে পশু, অচেতন প্রাণী বা যন্ত্র মনুষ্যবৎ আচরণ মারফত মানবিক জীবনবোধের প্রকাশকে দেখায়।
রমাপদর 'আাদী' এমনই এক গল্প ।এই গল্পে ময়না চৌকিদারের শিশুপুত্র দামুকে অঘোন বল্লমী এনে দিয়েছিল একটি হরিণশিশু। ময়না, মেয়ে রংলী, বিশেষত দামুর কাছে হরিনী আাদী প্রবল আকর্ষনের সৃষ্টি করে; আবার মান্ডির নেশা তাকেও ঘরের প্রতি আসত্ত ক'রে তোলে— ঠিক যেমন অঘোন আর রংলীর পরস্পরের প্রতি টান। উপরন্তু অঘোন রংলীকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু ময়না নারাজ ; সুতরাং প্রত্যাখ্যানের বেদনায় আাদীকে নিয়ে যায় সে। তবুও 'বন থেকে জানোয়ার তুলে আনা যায়, কিন্তু জানোয়ারের মন থেকে বন তুলে আনা যায় না। তাই কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে সঙ্গী পুষ হরিণের ডাকে সেও চলে যায় ঐ জঙ্গলখান্ডে, অঘোন দামুর কাছে ছুটে আসে, বলে আাদী বেঁচে থাকলেই সে খুশী। জঙ্গলখান্ডের দিকে চেয়ে প্রাণপনে অনুসন্ধান করে— কিন্তু কাকে — আাদী না প্রিয়তমা রংলীকে? প্রমাণিত হয়, মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো মানুষও অনুপেক্ষিত এক নেশায় আকৃষ্ট হয়, বাইরের কোনো প্রতিবন্ধকতা তাকে দমিয়ে রাখতে পারে না, বরং তাকে আরও বেশী আসত্ত ক'রে তোলে।
এখানে ব'লে নেওয়া ভাল যে, এই শ্রেণীর গল্পে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, লেখক তাঁর গল্পে মানবেতর পশুটির বর্ণনা এমনভাবে দেন, যাতে মানবচরিত্রের সঙ্গে ঐ পশু বা যন্ত্রটির কোনো তফাত নেই। সে যে চৈতন্যবান নয়, তা অন্তত ক্ষনকালের জন্য পাঠকের চোখে ধরা পড়ে না। অর্থাৎ লেখকের সহানুভুতিবোধ অতিমাত্রায় সক্রিয়। শুধু তাই নয়, মানবেতর পশুকে কেন্দ্র ক'রে যে সমস্ত চরিত্র গল্পে আসে, তাদেরও যেন কিছুটা পশুর সমতুল্য ক'রে তোলেন ।অর্থাৎ তার চেহারার বিবরণ, পরিবেশের বর্ণনা, আচরণ সর্বোপরি আবহসৃষ্টিতে আশ্চর্য সংযম ও কুশলতার পরিচয় দেন। তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী' গল্পে খোঁড়া শেখেরজৈব প্রবৃত্তি যা তার অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন তাই শুধু মার্জিত সমাজে অগ্রাহ্য নয়, তার বাইরের চেহারাও যেন কতকটা ওই অসভ্য আদিম পশু স্বভাবের খানিকটা কাছাকাছি। আবার সাপিনী নয়, তাই লেখক তার পূর্বে 'সর্পশিশু', 'কিশোরী' প্রভৃতি প্রয়োগ করেন, তার অসাধারণ রূপের পরিচয় দেন। এই গল্পেও লেখক পারিপার্শ্বিক বাতাবরণ সৃষ্টিতে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ময়না চৌকিদারের বাসস্থানের বর্ণনায় লেখক লিখেছেন ঃ "নিঃসঙ্গ নিঃশব্দ প্রান্তরের বুকে অন্ধকার রাত্রিতে সেখানে কোনোদিন আলো জ্বলে, কোনো দিন জ্বলে না।" আবার লেখক অঘোনের বর্ণনার লিখেছেন ঃ "নদীতে পা ডুবিয়ে বসে থাকে যে মোষের দঙ্গল, যার পিঠে চড়ে দু-একটা বাচচা ছেলে এপার-ওপার করে, অঘোন ও যেন তেমনি একটা গোঁয়ার মোষ।" অর্থাৎ অঘোনের অমার্জিত চেহ

ারাও যেন মনুষ্যেতর প্রাণীরই প্রায় নিকটবর্তী। এই ভাবে আাদীর প্রতি দামুর প্রবল টানের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক ঃ "ক াছে আসতেই তাকে জড়িয়ে ধরলো দামু,তার পিঠে পেটে গাল ঘষতে বললে, কে দিছে রে আাদী? বুন?" হরিনী আাদী আগমনে প্রবল আনন্দে দামুর ঘুম আসে না। লেখক সুকৌশলে দেখান যে আাদীও যেন সমস্ত রাত্রি জাগ্রত, লেখেন "হরিনটার চোখেও বুঝি ঘুম নেই।"

এই ভাবেই দামু এবং আাদীর সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মতোই আন্তরিক ও মূল্যবান। দামুর কাছে আাদী শুধু পোষা হরিণী নয়, মানববন্ধুর চেয়েও বেশী। তাই তার আচরণে, ব্যবহারে বা সংলাপে সে তাকে মানুষের মতোই চৈতন্যবান বলে মনে করে। এই কারণে, হরিনীকে সে জড়িয়ে ধরে, আদর করে, স্নেহের সুরে কথা বলে। আবার তার অনুপস্থিতিতে দামুর নারীর খারাপ হয়। তার বাবা অঘোনকে হরিণ নিয়ে যেতে বললে সে বাড়ির সকলের প্রতিই অভিম ানী হয়ে ওঠে। অভিমানগ্রস্ত দামুর অভিমান বাবা -দিদির প্রতি যতনা তার চেয়েও বেশী আাদীর প্রতি। আাদী কাছে এলে তার জ্বর ছেড়ে যায়, ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

অন্য দিকে এই গল্পে অঘোনের কাছে হরিনী আাদী যেন রংলীর প্রতিরূপ। তার মগ্ন চৈতন্যে হরিনী আাদী আর রংলীর কে ানো ভিন্নতা থাকে না তাই দেখি, রংলীকে বিয়ে করতে না পেরে সে আাদীকে ফিরে নিয়ে যায়, আবার আাদী চলে এলে সে যেন প্রিয়ার বিরহে কাতর হয়ে ওঠে এবং তার মঙ্গল প্রার্থনা করে। উপরন্তু গল্পের শেষে সে যেন আাদীকে ডাকে না, অভিমানিনী প্রিয়া রংলীকে জঙ্গলের মানুষ বল্লমী জঙ্গলে নিয়ে যেতে চায়। বাস্তবিকই, অঘোনের কাছে রংলী ও আাদীর কে ানো প্রভেদ থাকে না, সেও যেন জঙ্গলের হরিণের মতোই চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আবার, গল্পের প্রারম্ভে রংলী নিষাদ অঘোনকে ভয় পায়, দামুকে নিষেধ করে যে, ডাকাত বল্লমীর কাছে সে যেন না যায়। ঠিক যেন কোমল প্রাণী ভী আাদীর মানবশিকারী তথা ক্ষুধে প্রভুকে দেখে ভয় পাওয়া । পরে আবার, মানবশিশু দামুর সঙ্গে আাদীরমধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে ; ময়না, রংলী, অঘোন সকলেই মেনে নেয়। একইভাবে, মহিষের মত চেহারার অধিকারী শিকারী অঘোনই রংলী প্রিয় হিসাবে মেনে নিতে পারে। এইভাবেই রংলী ও আাদী পরস্পরের প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে।

উপরন্তু, আাদী জীবন্ত হয়ে উঠেছে তার স্বকীয় সজীব ও স্বতঃস্ফুর্ত মানবতুল্য আচরনে। তার সক্রিয় আচরণে সে যে চৌকিদার পিরবেশেরই অন্যতম তাই প্রকাশিত। দামুদের বাড়িতে আাদী ভীত ও সন্ত্রস্ত, নতুন পরিবেশে সে যেন মানিয়ে নিতে পারছে না, স্পষ্টই অভিযোগ করতে চায়, প্রকাশ করতে চায় তার বেদনাকে ঃ "দুটি গভীর কালো চোখ কি বলতে চ ায়। কান দুটো যেন কি শুনতে চায়। এই ভাবেই মানুষ হরিনের মধ্যে যোগসাজস রচিত হয়ে যায় এই গল্পে।

৯. রমাপদ চৌধুরীর গল্পের প্রকরণের মধ্যে আশর্চ্য প্রবহমানতা চোখে পড়ে আমাদের। গল্পগুলি বলার সময় যেন কোথাও আটকে যায় নি, থেমে থাকে নি কোন প্রতিবন্ধকতায়, বরং নদীর বিরামহীন স্রোতের মতো বিলম্বিত লয়ে বয়ে চলেছে অদূর কোনো গন্তব্যের উদ্দেশ্যেশে। তবে অবশ্যই তা সংঘাতহীন নয়। প্রয়োজনে যে দ্রুত ও অতি দ্রুত লয় গল্পে অনিবার্য হয়ে ওঠে, তাও এনেছেন গল্পকার। ত্রড়ন্সভ্রন্দ্ধ এবং telling এর যে প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্যে এবং পরিস্থিতির উপযুক্ত বিন্যাসে স্ বতঃস্ফূর্ততাকে নিয়ে

আসে, তা যেন গল্পকারের আয়ত্তে। সেই অনুভূতি দিয়ে প্রকরণকে-ও প্রাণবন্ত করেছেন তিনি। গল্পসমগ্রের ভূমিকায় রম াপদর নিজস্ব অভিব্যক্তি যে, রণক্ষেত্রের দামামার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ যখন কোন মিনারের চূড়ায় বসে ঔপন্যাসিক টুকতে বসেন এবং ইনিয়ে বিনিয়ে লিখে নেন তার খুঁটিনাটি প্রতিটি কথা ; তখন পথের পাশে একটি বৃক্ষছায়ায় উপবিষ্ট কোন উদ াস দৃষ্টিমেলা ছোটগল্প লেখককে দেখে তার মনে হতেই পারে— "এ কোন উন্নাসিক লেখক?" "কোনো মিনারের চুড়ায় উঠলো না, দেখলো না যুদ্ধের ইতিবৃত্ত, শোভাযাত্রার সঙ্গ নিলো না, এ কেমনধারা সাহিত্যিক?" কিন্তু ছোটগল্প লেখক? "অত্যন্ত দীর্ঘ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ চেয়ে তাকাবেন ছোটগল্পের লেখক, বলবেন হয়তো, না বন্ধু এসব কিছুই আমি দেখিনি। কিছুই আমার দেখার নেই। শুধু একটি দৃশ্যই আমি দেখেছি। পথের এ পারের কোন গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করবেন তিনি, সেখানে একটি নারীর শঙ্কাকাতর চোখ সমগ্র শোভাযাত্রা তন্নতন্ন করে খুঁজে ব্যর্থ হয়েছে, চোখের কোণে যার হতাশার অশ্রুবিন্দু ফুটে উঠেছে— কেন যেন ফেরে নি, কে একজন ফেরেনি। ছোটগল্পের লেখক সেই ব্যথা

বিন্দুর, চোখের টলোমলো অশ্রুর ভেতর সমগ্র যুদ্ধের ছবি দেখতে পাবেন, বলবেন হয়তো, বন্ধু হে, ঐ অশ্রুবিন্দুর মধ্যেই আমার অনন্ত সিন্ধু।" ছোটগল্প বিষয়ে লেখকের এই উক্তির সঙ্গে সহমত হয়তো অনেকেই পোষন করবেন না— সে বিতর্কে প্রবেশ করতেও আমি চাই না। শুধুমাত্র এই কথাই আমি বলতে চাই, যে পুষ্পিত কোমল অনুভুতি ছোট্ট গল্প লেখকের কাছে কোন-ও কোন পাঠক প্রত্যাশা করে থাকেন— যেন কোন কথাকোবিদের নির্ভীক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজস্ব অনুভূতি। সেই Subjective ভাবনা কিন্তু যার মধ্যে প্রকাশ পাবে না কোন বাহ্যিক আতিশয্য বা সাজসজ্জার বাড়াবাড়ি। যদিও ফ্লবেয়ার কথিত নৈর্ব্যক্তিকতা অর্থাৎ নিরাসক্তি রক্ষা কারা বোধ হয় সম্ভব নয় কোন সাহিত্যিকের পক্ষেই, তবু-ও আপাত এই নিরাসক্তিই তাঁর ছোট গল্পগুলিকে স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে। অথচ এই নিরাসক্তি এত তীব্র নয় যে স্রষ্টাকে নির্মম বলে মনে হয়। বরং লেখকের প্রখর ও সুগভীর দৃষ্টিকে পাঠক উপলব্ধি করতে পারে ; ফলে, পাঠকের মনে হয় যে, আমাদের চারপাশেই ত' এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে যাচ্ছে, অথচ, আমরা ত' এমন ক'রে দেখিনি, ভাবি নি এমন ক'রে। মানুষের আচরণ ও অন্তরের যে বিপ্রতীপতা, নিজের শূন্যগর্ভ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার অহেতুক প্রয়াস, এমনকি পাঁচজনের কাছে তাকে আড়াল করা, অর্থাৎ ভালো দেখানোর কণ অপচেষ্টা, সময়ে সময়ে নিজেকেও প্রবঞ্চনা করা— সমস্ত কিছুকেই দক্ষ শিল্পির তুলির ছোঁয়ার দৃশ্যগোচর ক'রে তুলেছেন লেখক।

রমাপদর বেশীর ভাগ Serious গল্পগুলির ভাষা অত্যন্ত সাবলীল এবং অনায়াস। ক্রমানুসারে, যে-যে শব্দ প্রয়োগের দ্বারা কোন বাক্য সুগঠিত হয়ে ওঠে এবং বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাষাও হয়ে ওঠে সুনির্বাচিত— তা যেন তাঁর অধিগত। সূক্ষ্ম ভাষা প্রয়োগের দ্বারা তাঁর ছোটগল্পগুলি চমৎকার হয়ে উঠেছে। আমরা ক্রমানুসারে সেগুলি দেখানোর চেষ্টা করব।

পরপর দু'বার একই শব্দ ব্যবহার ক'রে একইসঙ্গে কথকের tension এবং সময়ের সূক্ষ্মতা বা প্রসারতায় ভাষায় সৌন্দর্য সঞ্চারিত হয়েছে ঃ

ক. "সায়ন্তন, ক্ষ সায়ন্তন, বলে উঠলো, নিজের বুক চিরে কাউকে যদি হৃদপিন্ডটা তুলে দেখাতে হয় সেজন্যই।"

খ. "এক মুহূর্ত। এক মুহূর্ত দেরি হলেই গাড়িটা দময়ন্তীকে চাকার তলায় পিষে ফেলতো, তার শরীরকে ছিন্নভিন্ন করে তার রক্তের ঝর্ণায় সমস্ত পথ রাঙিয়ে দিয়ে যেতো।

গ. "অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ কতক্ষণ আমি আজও জানি না

ঘ. "আমি ভাবলুম, কৃতজ্ঞতার মূল্য হিসাবে আমি সায়ন্তনকে সব সব দিতে পারি।"

ঙ. "সায়ন্তন হেসে বললে, আমার সাহস নেই, তুই, তুই-দেখ অনিমেষ।"

কখনো বক্তব্যের মধ্যে জোর সঞ্চারিত হয়েছে; সাধারণত বাক্যের শেষে দু'বার একই শব্দ ব্যবহারের দ্বারা অবচেতন উঁকি দেওয়া অপরাধবোধ সজ্ঞানচেতনাকে প্রবল ভাবে প্রভাবিত করেছে ঃ

ক. "মনকে বোঝাতে চাইলাম, ভুল করেছি, ভুল করেছি।"

খ. "মনে হয়েছে শুধু ওই মেয়েটিই নয়, আমি—আমরা সকলেই যেন হেরে গেছি, হেরে যাবো।" (গত যুদ্ধের ইতিহাস)

গ. মনে হবে, আত্মহত্যা নয়, অ্যাকসিডেন্ট নয়, অসীন্দেুকে হত্যা করেছি, হত্যা করেছি আমি।" (তিতির কান্নার মাঠ)

কখনো একই শব্দ দিয়ে পরপর বাক্য শু ক'রে দ্বাস মুহূর্তেকে পরিস্ফুট করেছেন লেখক। (লক্ষনীয়, এখানে আমরা দুবার বাঁচা গল্পটিকে উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরলাম । এই গল্পে তিনবার উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। প্রথমবার দময়ন্তীকে যখন কাঠিয়ালরা গাড়িতে অপহরণ ক'রে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়বার দময়ন্তী জলে পড়ে গেলে ; এবং তৃতীয়বার কথকও সায়ন্তনের তীব্র উৎকণ্ঠা দময়ন্তী কাকে ভালবাসে । এখানে ক্রমানুসারে ১,২, ৩ নং দিয়ে চিহিত করা হল। প্রথম দুই উৎকণ্ঠায় বাক্য শু হয়েছে 'আমি শব্দ দ্বারা। এখানে যেন কথকের দৃঢ় সঙ্কল্প ও শপথ প্রকাশিত হয়েছে— দময়ন্তীকে বাঁচাতে হবে। তৃতীয়বার 'যেন' শব্দ দিয়ে বাক্য শু হয়েছে এখানে দময়ন্তী কাকে ভালবাসবে জানা নেই সেই ভালবাসার উপর তাদের দুজনের জীবনের অনেক কিছু নির্ভর করছে, তাই সংশয় প্রকাশিত হয়েছে।

১. "আমি নিমেষের জন্য ভাবলাম, মেয়েটিকে বাঁচাতে হবে।

"আমি পলকের জন্য ভাবলাম, মেয়েটির সম্মান বাঁচাতে হবে।

"আমি মনে মনে বললাম, আমি বাঁচাবো, কিংবা হত্যা করবো।

২. ‘‘আমি চমকে ফিরে তাকিয়ে দময়ন্তীকে দেখতে পেলাম না।
‘‘আমি চোখ বন্ধ করে দেখতে পেলাম সায়ন্তনের শরীরটা নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।
‘‘আমি পোলের ধারের খাটো রেলিং থেকে ঝুঁকে নীচে, অনেক নীচের নেশারী নদীর আলো মাখা কালো-কালো ঢেউয়ের দিকে তাকালাম।
‘‘আমি, আমি পাগলের মতো কংক্রিটের পোল থেকে ছুটে নেমে গেলাম।’’
৩. ‘‘যেন এখনই আমাদের যে কোনো একজনের স্বপ্ন সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।
‘‘যেন আমরা এখনই পরস্পরের শত্রু হয়ে উঠবো।

আবার, রমাপদর ছোটগল্পের বর্ণনাভঙ্গির বিশেষ প্রকৌশল ভাষাকে স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে— ‘‘মারাটা ম্যানেজারের ফরাসী মেম থাকতেন কোলকাতায়। ঢিলার ওপর জগতে নারীত্বের প্রতিনিধি ছিলো শুধু বড় মুনশীর নেপালী আয়া, ঠিক াদার গোপী সিং এর অসূর্যম্পশ্যা গৃহিনী, আর আর্মেনিয় জোসেফ সাহেবের পঙ্গু মেয়ে। ঘর ছিলো আমাদের । ছিলো ন া ঘরনী। অরণ্যজগতের বিভীষিকা আর ভালো কয়লার পাতালরাজ্যের মাঝখানে আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবীতে তফাত ছিলো না বিবাহিত আর ব্যাচেলারে। তাই গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠলো সবাই।’’
লক্ষনীয়, ছোট্ট বাক্য ‘গুঞ্জনে’ শব্দের পর উপযুক্ত শব্দ ‘মুখর’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ‘ঘর ছিলো আমাদের, ছিলো না ঘরনী’ যেন ছন্দসান্দ কানে শোনা যাচ্ছে। পরক্ষণেই ব্যবহার করা হয়েছে যথাক্রমে ‘নেপালী’, ‘অসূর্যম্পশ্যা’ এবং ‘পঙ্গু’, — যা আপাতনিরীহ কিন্তু ভয়াবহ। যারা নামমাত্র নারীত্বের প্রতিনিধি কেননা প্রথম শব্দের ক্ষেত্রে রয়েছে ভাষা সমস্যা, দ্বিতীয়ের ক্ষেত্রে পর্দা সমস্যা অর্থাৎ মনের সমস্যা এবং সবশেষের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা। অর্থাৎ এইভাবে একজন পুষের কাছে নারী সংসর্গহীন জীবন আর কোলিয়ারীর বিভীষিকাময় পাতালের অন্ধকার এক হয়ে গিয়েছে। এই বৈপরীত্য মূলক সৃষ্টি ক’রে অনুপমকে উপস্থিত করেছেন লেখক । ‘সবুজের শোভা’ এবং ‘লাল পলাশের প্রতীক’ অনুপমার স্থাপন ল াবন্যময় এবং প্রাণবন্ত ক’রে তোলে পরিবেশকে।
আবার, উপমাগুলি নিছকই প্রয়োগ নয়, ভাববস্তু ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাই সেগুলি সচেতন পাঠকের চোখ থেকে এড়িয়ে যায় না। স্থানাভাবে কয়েকটি অর্থ অলংকার তুলে দিলাম। কথকের প্রথমের দিনগুলি অজানা তাই রহস্যময়। কিন্তু সুন্দর ও সৌগন্ধময়। সুতরাং লেখক লিখেছেন ঃ
(১) ‘‘ক্যামেলিয়া ফুলের মতো উজ্জ্বল সেই আলোকিত কিশোরীর চোখে আমি জানি না কিসের ছায়া আবিষ্কার করেছিলাম,। শুধু জানি, একটি রজনীগন্ধার বনের ওপর দিয়ে সন্ধ্যার বাতাসের মতো আমাদের দিনগুলো এক অভাবনীয় রোমাঞ্চে র মধ্যে কেটে গিয়েছিলো।’’
এই গল্পের অন্যতম চরিত্র সায়ন্তন উগ্র, কথকের প্রতিস্পর্ধী। কিন্তু তার রূঢ়তাও পেলব দময়ন্তীর কাছে শোভনীয়।
(২) ‘‘আমি মনে মনে প্রা করতাম, নিষ্পত্র বৃক্ষের মতো সায়ন্তনের সমস্ত বৃক্ষতা দময়ন্তী কাছে এলেই কেন সবুজ পাতায় ঝলমল করে ওঠে।’’
সভ্যসমাজের কাছে অসংগতি ; নগরের অট্টালিকার মাঝে খুপুড়ি ঘর। আছে, থাকে, এমনি ক’রে চলে আসছে, থেকেও য ায়। সুতারাং প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ঃ

(৩) ‘‘ফুটপাতের গায়েই দুটো না তিনটে বে-দরোজা খুপুড়ি পড়ে আছে অন্ধকারে, আলো ঝলমল এক সারি দোকানের ম
াঝে। চকমকি চোখ সুন্দর একটি বাচচা মেয়ের ফোক্‌লা দাঁতের মতো ছন্দঃপতন।’’
আরো দু’একটি অলংকার—
(৪) ‘‘জুঁই ফুটফুটে ছোট্ট একটি মেয়ে। ..... ফুলঝরির মতো একমুখ হেসে নমস্কার জানালো অনুপমা। ..... হাতে নিঃসঙ্গ সাদা শাঁখা, সুন্দর হাসি হাসি মুখে দু’সারি মুক্তোর চমক, চিবুকে মিলিয়ে যাওয়া ক্ষতের দাগ, আর সিঁথিতে সিঁদুর নয়,

যেন একটি রক্ত পলাশের পাপড়ি।"

(৫) "ঢিলার উঁচু আসনের উপেক্ষিত দিকটায় ছিলো আমাদের কোয়ার্টার, আর কোলিয়ারির আপিস আদালত, ডাকঘরকে ঘিরে সীজন ফ্লাওয়ার আর পাতাবাহারে সাজানো বাংলোয় থাকতেন ম্যানেজার থেকে জে-পিও অবধি ছোট বড় মাঝারি সাহেবরা। ফাল্গুনের শুধু ফুল ন্যাড়া পলাশের মতো ছুটির সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে কেরানীকুলের পাতা ঝরিয়ে কৌলীন্য বজায় রাখতো বাংলোবাহার উঁচু দুনিয়া।

শুধু অলংকার প্রয়োগে সামঞ্জস্যই আনেননি, বিশেষন গুলিও উপযুক্ত ও যথাযথ ; সুতরাং সুন্দর।

"সাদা চাদরের মত মুখ। বিষন্ন, ক্লান্ত, পরাজিত।"

অনেক সময় রমাপদ চৌধুরী তাঁর গল্পের গদ্যে সমান্তর পদ সৃষ্টির মাধ্যমে অভিনবত্ব এনেছেন। সেগুলির প্রয়োগ সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক। "উত্তর জানার জন্য আমরা উৎসুক হয়ে উঠলাম। সম্মান বাদ দিয়ে জীবনের দাম কতটুকু? কিংবা জীবন না থাকলে সম্মান অর্থহীন কিনা। আমরা জানতে চাইলাম, দয়মন্তী কাকে ভালবাসে? জীবন না আত্মসম্মান? সায়ন্তন না অনিমেষ।" লক্ষনীয়, এখানে সমান্তর পদ সৃষ্টি করেছেন লেখক । 'সম্মান', 'বাদ দিয়ে', 'জীবনের দাম কতটুকু', এবং যথাক্রমে 'জীবন', 'না থাকলে', 'সম্মান অর্থহীন কিনা' প্রভৃতি পদ বা বাক্যংশগুলি সমান্তরালে স্থাপিত। আবার 'আমরা উৎসুক হয়ে উঠলাম' এর সঙ্গে 'আমরা জানতে চাইলাম', অথবা 'জীবন', 'না', 'আত্মসম্মান' এর সঙ্গে যথাক্রমে সায়ন্তন 'না', 'অনিমেষ' সমান্তরাল। এছাড়াও এখানে যেন দময়ন্তীর জীবনের প্রতীক সায়ন্তন, দময়ন্তীর আত্মসম্মানের প্রতীক অনিমেষ।

ছোটগল্পে বর্ণনার দিকেই তাঁর প্রবণতা বেশী। কিন্তু বর্ণনাগুলি নিছকই বর্ণনা নয়,। তা আগেই বলেছি। প্রকৃতির যে চিত্র কোনো কোনো ছোটগল্পে রমাপদ এঁকেছেন, তা নেহাতই চিত্র নয়, প্রকৃতি কখনো কখনো যে মানবস্বভাবেরই বহিঃপ্রকাশক সত্তা তা-ওতিনি দেখিয়েছেন। তাঁর পরিবেশনের গুণে পরিবেশ বর্ণনা, প্রকৃতি 'রাস্তাটা ছায়া-ছিমছাম। লাম্প পোষ্টগুলো দূরে দুরে, কৃষ্ণচূড়া আর গুলমোহরের পাতায় আড়াল করা নিস্তব্ধতা। সিমেন্ট বাঁধানো চওড়া ফুটপাতে কেমন একটা অন্ধকারের ছমছমানি। শুধু অন্ধকারই নয়, আরেকটা জিনিস চোখে পড়লে শিউরে ওঠা উচিত। কিন্তু চোখে পড়েও চোখে পড়ে না।

সুনিপুণভাবে গল্পকার বর্ণনা করলেও তাঁর সংলাপও নেহাত উপেক্ষনীয় নয়। ছোট ছোট সংলাপ যা গল্পকার ব্যবহার করেছেন তাতে পাত্রপাত্রীর স্বরভঙ্গী তথা চরিত্র ফুটে উঠেছে।

"বললাম, তার ওপর আমার তো হাত ছিলো না লোনা, তুমি জানো। ।

—হাত ছিলো, হাতে শক্তি ছিলো না বলো। ..... বললাম, ছি ছি! একথা আমি কোনো দিন কল্পনাও করি নি লোনা । এত নীচ আমাকে ভেবো না তুমি।.....

বললাম, তোমার সুখের সংসার ভাঙতে চেষ্টা করবো একথা তুমি ভাবলে কি করে? তুমি সুখে থাকো, ভালো থাকো—এইটুকুই আমি চাই।.....

ধীরে ধীরে বললে সে, এত ন্যায় -অন্যায় যদি বোঝো, তবে পুরোনো দিনের কথাটা মনে পড়িয়ে দিলে কেন?.....

বললে, পুরোনো দিনের কথা ভেবে বেঁচে থাকাটা অপরাধ নয়, পুরোনো দিনে ফিরে যাওয়াটাই অপরাধ, তাই না? .....

রমাপদর গল্পগুলির সমাপ্তি অতিশয় সুন্দর । কখনো কোনো কোনো গল্প শেষ হয়েছে আকস্মিকতায় ।

"শুধু প্রভাস বললে, কে জানে হয়তো আপনারই দুর্নাম বাঁচাবার জন্যে।"

"কিন্তু লাটুয়া কি সত্যিই বেঁচে আছে? ফিরে আসতে আসতে বারবার প্রশ্ন জাগলো মনে"।

(লাটুয়া ওঝার কাহিনী)

কোনো কোন গল্প সমাপ্ত হয়েছে বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

"যে কোনো রবিবারে রাত সাড়ে আটটার সময়ে খোঁজ করলে কোনো-না কোনো সিনেমা হলের সামনে আপনারাও নিদির দেখা পাবেন, দেখবেন হয়তো দেয়ালের ছবিগুলো দেখছেন নিদি, হাতে দু আনা দামের একখানা চটি বই। আর একটু পরেই দেখবেন কোনো-না-কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ জুড়ে নিদি জেনে নিচ্ছেন কে কেমন অভিনয় করছেন, কে

ান গানটা ভালো, ছবির শেষটা কি রকম!" (দুধের স্বাদ)
গল্পের শেষের প্রশ্নাত্মক মন্তব্যও মুগ্ধ করে পাঠককে । "আনারবাগের দুর্নামী রটনা শুধুই মোতিকুমারীর বিয়ের সঙ্গে মাব াঈয়ের বিমান দুর্ঘটনার যোগাযোগ আবিষ্কার করে তৃপ্ত
হলো।" (মাবাঈ)
"শান্তির দূত যীশুর গরিমা প্রচারের জন্যেই তো যুগে যুগে হিংস্র ট্রুশেডারদের অভিযান। ঈশ্বরের পুত্র যেসাসের ক্ষমা আর অহিংসার ধর্মকে পবিত্র করে তুলতে রেভারেন্ডব্রাউনের হাত কতটুকুই বা লাল হলো। তার বদলে ঈশ্বর লাপরার মাটিকে আলো দেবেন অনেক বেশী। আমেন।" (দরবারী)
কোনো কোনো গল্পের শেষ হয়েছে জীবন সম্বন্ধে কোনো সুগভীর দার্শনিক প্রত্যয় উচচারণের মাধ্যমে। লেখকের মন্তব্য চিরন্তন কোনো সত্যকেই ব্যক্ত করেছে। "..... ইতিহাস শুধু বইয়ের পাতায় নিঃশব্দে পড়ে থাকে না, ইতিহাস আম াদেরই আশেপাশে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে বেড়ায়।" (গত যুদ্ধের ইতিহাস)
এখনও হতে পারে এই সমস্ত কিছুই হয়ত, রমাপদ ভেবে করেন নি, অনেক কিছুই হয়ত, শিল্পীর তুলির স্পর্শে আপনা - আ পনিই এসে গেছে। সেটা প্রশ্নও নয়। প্রশ্ন হল যা আমরা পেয়েছি কেন তা এত শ্রুতিসুখকর কেন তা আমাদের অন্তর ছুঁয়ে য ায়, কেন ভালো লাগে। আর এই কেন-র উত্তর খুঁজতে গিয়েই পাঠকের কিছু কল্পনা এসে যায়, এসেও গিয়েছে । যাইহে াক, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রমাপদর গল্পের ভাষা সম্বন্ধে বলেছিলেন ঃ তোমার গল্পের তুলনা হয় না, কিন্তু অতুলনীয় তে ামার সংকলনের নামটি। 'সমগ্র' শব্দকে পিছিয়ে দিয়ে সাধারণকে অসাধারণ করে তুলেছো। তোমার ভাষার মধ্যেও এক বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছি। একেবারেই সহজ কথাকে একটু এদিক ওদিক করে দিয়ে ব্যঞ্জনায় তাকে সহজ সুন্দরী করে তোলে া। কমপ্লিট ওয়ার্কস বা কমপ্লিট শর্ট স্টোরিজ বোঝাতে বাংলায় এমন অর্থগর্ভ সুষমাময় শব্দ হাতের কাছেই ছিল, অথচ কেউ ব্যবহার করে নি। স্থানবদল ঘটিয়ে এভাবে তো নয়ই। দেখো একদিন সমগ্র নামটিকে সবাই লুফে নেবে, গল্পসমগ্রকে তো অবশ্যই"। অচিন্ত্য কুমারের অনুমান সঠিক এটুকু বলা যায়।
রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পের সামগ্রিক পর্যালোচনায় বলা চলে যে, তাঁর গল্পগুলিতে নেই অযথা আড়ম্বর, কিংবা অন্তঃস ারশূন্য কৃত্রিমতা। বলবার ভঙ্গিটি এমনই সাবলীল, সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত যে তা সহজেই আকৃষ্ট করে পাঠকদের। গল্পগুলির পাত্র পাত্রীও কোনও স্বপ্নের জগৎ কিংবা কল্পনার জগতের বাসিন্দা নয়, তারা নগর কলকাতার কিংবা ছোটখ াট শহরের মফস্বলের বা নিদেনপক্ষেগ্রামেরই পরিচিত মানুষ— যারা নানা জটিলতায় ভোগে, মধ্যবিত্ত সুলভ টেনসন রয়েছে যাদের ভড়ং যাদের আগাগোড়া আচ্ছন্ন এবং নিয়ত যন্ত্রনায় আলোড়িত। এক জীবনেই বহুবার জন্মান্তর ঘটে যায় তাদের। তিনি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এমন চরিত্র সৃষ্টি করেন যারা ভুল করে কিন্তু অনুভুতিশীল, অতিরক্তি জান্তব প্রকৃতির অধিকারী নয়,। তাই, সেই অনুভুতির যন্ত্রনা অতিশয় কোমল ও মধুর ক'রে পরিস্ফুট করতে পেরেছেন গল্পকার। সাধ ারণত কোন আকস্মিক হত্যা বা আত্মহত্যার ব্যাপার নেই, যৌন চেতনার দিকেও অতিরিক্ত কোনঝোঁক নেই গল্পকারের। পুরোনো স্মৃতি যা যন্ত্রণাদায়ক অথচ সময়ের প্রলেপে যার ক্ষয়ীভবন ঘটে এবং কোন এক সময় হারিয়েও যায়— এই সত্যটিকে শিল্পের সঙ্গে মিলিয়ে পরিবেশন করেছেন তিনি। লাগামছাড়া কোন কিছু কল্পনা করাও তাঁর স্বভাববর্হিভূত তাই বেশীর ভাগ গল্পই তাঁর অভিজ্ঞতা প্রসূত। যা তিনি দেখেন নি, নিজের মতো অনুভব করেন নি, নিছক কৌতুহলের বশেও যেন তা চিত্রিত করতে চাননি তিনি।
রমাপদ দেখেছেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা অস্থিরতা ব্যক্তিকে অস্থির ক'রে তুলেছিল। ফলত,মানুষ ক্রমশই সুস্থ জীবনযাপন ও স্বাভাবিক মুল্যবোধগুলি থেকে দূরে সরে এসেছে। তবুও তিনি মানবিক মূল্যবোধগুলি থেকে দূরে সরে যেতে পারেন নি, চানও নি—
ক. "কৃতজ্ঞতার প্রতিদান হিসেবে মানুষ বোধ হয় অনেক বেশী মূল্য চায়।"
খ. "কৃতজ্ঞতার চাইতে প্রেম অনেক বড়।"
বিশেষ ক'রে যে সমস্ত গল্পে লেখক কথকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ সেই সমস্ত গল্পে আত্ম সমালোচনা করতে তিনি ছাড়েন নি।
ক. "অহঙ্কার আমার কানে কানে বলতো, অনিমেষ তুমি দময়ন্তীকে অসম্মানের জীবন থেকে বাঁচিয়েছো, তার ওপর স ায়ন্তনের কোনো অধিকার নেই।"

খ. “না, লহনার শিশুপুত্রকে আদর করে লহনারই মন
ভোলাতে চাইছিলাম।”
গ. “বোধ হয় ঘুমোনো হিংসে।”

মানুষের গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার মধ্যে যে নির্মমতা ও নৃশংসতা রয়েছে তার ভয়াবহ ও প্রত্যক্ষ চিত্র নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে দেখি। যুদ্ধের বীভৎসতা, মন্বন্তরের ভয়াবহতার সরাসরি রূপ দেখি তাঁর গল্পে। কিন্তু রমাপদ এই ক্রুরতার পরোক্ষ চিত্রণেই আগ্রহী। তিনি আভাসে তা বুঝিয়ে দেন, ব্যঞ্জিত সত্যেই যেন বেশী আগ্রহী।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com